# চতুৰ্থ অধ্যায়

# শ্রেণিচেতনা, শ্রেণিসংগ্রাম এবং

# গণনাট্য সংঘের নাটক (১৯৪৩-৬৫)

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রকাঠামোয় কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্তকে শ্রেণিচেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তাকে শ্রেণিসংগ্রামের প্রধান পতাকাবাহী করে তোলার ক্ষেত্রে গণনাট্য সংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই সংঘের নাট্যাদর্শে মানব চরিত্র ও সমাজকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিতে বামপন্থী শ্রেণিচেতনার ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই অধ্যায়ে আমরা আলোচিত সময়কালের মধ্যে গণনাট্য সংঘের নাটকের কাহিনিবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণে শ্রেণিচেতনা ও শ্রেণিসংগ্রামের স্বরূপ খোঁজার চেষ্টা করব। সেই আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা বামপন্থী মতাদর্শ অনুযায়ী শ্রেণি ও শ্রেণিসংগ্রামের প্রাথমিক ধারণার অবতারণা করব। কার্ল মার্কস তাঁর ক্যাপিটাল গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৫৩ তম অধ্যায়ে শ্রেণি সম্পর্কে প্রথম আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন।<sup>১</sup> পরবর্তীকালে ১৯১৯ সালে লেনিন তাঁর 'A Great Beginning' গ্রন্থে বলেছেন,

"Classes are large groups of people differing from each other by the place they occupy in a historically determined system of social production, by their relation (in most cases fixed and formulated in law) to the means of production, by their role in the social organization of labour, and, consequently, by the dimensions of the share of social wealth of which they dispose and the mode of acquiring it. Classes are groups of people one of which can appropriate the labour of another owing to the different places they occupy in a definite system of social economy."<sup>\*</sup>

অর্থাৎ শ্রেণি হল সমাজের বড়ো গোষ্ঠীগুলি, যাদের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে সামাজিক উৎপাদনব্যবস্থায়, উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে, শ্রমের মাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা রয়েছে। এই সামাজিক গোষ্ঠীগুলির প্রত্যেকটি অন্য গোষ্ঠীর শ্রম আত্মসাৎ করতে সক্ষম। ইউরোপে পুঁজিতন্ত্রের উদ্ভবের পর সমাজের দুটি মৌলিক শ্রেণি দাঁড়ায় বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত। বুর্জোয়া শ্রেণি বলতে বোঝায় অশ্রমজীবী বৃহৎ মালিক, যারা শিল্পে ও কৃষিতে উদ্বৃত্ত মূল্যের শ্রমে মুনাফা অর্জনকারী। এদের বিপ্রতীপে থাকে প্রলেতারিয়েত শ্রেণি। যারা পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণে শ্রমশক্তি বিক্রয় করা সত্ত্বেও উৎপাদনের উপকরণ থেকে বঞ্চিত।<sup>°</sup> শিল্পবিপ্লবের পরে সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদ হলে ইউরোপে মূলত শ্রমিকদেরই প্রলেতারিয়েত রূপে গণ্য করা হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে কৃষক সম্প্রদায় হয়ে উঠেছিল প্রলেতারিয়েতের প্রধান সহযোগী।

শ্রেণিবিভাগের মাপকাঠি হল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আত্মিক জীবন। যদিও শ্রেণির বিভাগ মূলত অর্থনৈতিক, যার ফলে শোষক শ্রেণি শ্রম আত্মসাৎ করতে পারে। অর্থনৈতিক শ্রেণিবৈষম্যের কেন্দ্রীভূত প্রকাশ ঘটে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। শ্রেণিবিভাজনের ফলেই সমাজের প্রতিটি শ্রেণির মধ্যে আত্মিক জীবন ও সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শে ব্যাপক পার্থক্য দেখা দেয়। এই বিভেদ নিরসনের জন্য প্রয়োজন পড়ে শ্রেণিসংগ্রামের। অর্থনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে দৈনন্দিন আশু স্বার্থ যেমন বেতন বৃদ্ধির দাবিতে, ছাঁটাই লকআউটের বিরুদ্ধে, বেকারত্ব নিরসনের জন্য লড়াই গুরুত্ব পায়। আদতে প্রতিটি অর্থনৈতিক শ্রেণিসংগ্রামে রাজনৈতিক সংগ্রামেক জোটবদ্ধ করে। যার ফলে সামাজিক মুক্তি, পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের উৎখাত, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই ক্রম্বে সমাজতন্ত্রের আগমন ত্বরাম্বিত করে। অবশ্য সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেই শ্রেণিসংগ্রামের কাজ শেষ হয়ে যায় না।<sup>8</sup> ভাবাদর্শের সংগ্রাম বলতে বোঝানো হয় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্বপ্রচার, সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচন, শ্রেণিবিভক্ত সমাজের পতনের ভবিষ্যৎ বাণী প্রচার এবং সমস্ত শোষিত-মেহনতি মানুষকে সমাজবিপ্লবের যোদ্ধা হয়ে ওঠার আহ্বান। ভাবাদর্শীয় সংগ্রামের ক্ষেত্র তাত্ব্বিক প্রবন্ধ, ম্যানিফেস্টো, পার্টি-পত্রিকা ছাড়াও শিল্প-সাহিত্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

প্রসঙ্গত প্রতিটি দেশে শ্রেণিসংগ্রাম ও সমাজবিপ্লবের পদ্ধতিগত পার্থক্য আছে। রাশিয়াতে লেনিনের নেতৃত্বে যে পদ্ধতিতে বিপ্লব এসেছে তার সঙ্গে চিনে মাও-জে-দং-এর নেতৃত্বের বিপ্লবের গুণগত তফাৎ আছে। ফলে দেশ ও কালের বিচারে বামপন্থী শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও পার্থক্য আছে। ইতিহাসের গতিপথে ভারতবর্ষের সঙ্গে রাশিয়ার বা চিনের বিরাট পার্থক্য আছে। ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের ফলে সামন্ততন্ত্রের কবরের উপর পুঁজিবাদের উত্থান কিংবা সামন্ততন্ত্র-ঔপনিবেশিকতার জাঁতাকলে পিষ্ট চিনের রাষ্ট্রব্যবস্থা তাদের সমাজবিপ্লবকে নিজস্ব অভিমুখ দিয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে

স্বাধীনতা-পূর্ব ও স্বাধীনোত্তর সময়ে আধা-পুঁজিবাদী, আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে বারবার বিভ্রান্ত হতে হয়েছে।

গণনাট্য সংঘের ক্ষেত্রে বরং পুঁজিবাদ ও সামন্ততন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচনে অধিকতর জোর দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সমসাময়িক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, ঘটনাবলি, সরকারি-বেসরকারি নীতির প্রভাবে শ্রেণিচেতনার উন্বেষকে সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাঙালি শ্রেণিচরিত্রের চিরাচরিত স্ববিরোধিতা, স্থিতিশীলতা ও দ্বন্দ্ব-জর্জরিত অবস্থা ঝেড়ে ফেলে তাকে শ্রেণিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক অবস্থান, সংঘের সাংগঠনিক পরিকাঠামোর কারণে আমাদের আলোচিত সময়ে শ্রেণিচেতনা ও শ্রেণিসংগ্রামের কাহিনি নির্মাণের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক পরিবর্তন এসেছে।

গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত নাটকগুলির কাহিনি ও চরিত্র নির্মাণের উপর ভিত্তি করে আমরা এই অধ্যায়কে চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ : কৃষি-অর্থনীতি, কৃষক শ্রেণি, কৃষক আন্দোলন এবং গণনাট্য সংঘের নাটক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শ্রমিক শ্রেণি, শ্রমিক আন্দোলন এবং গণনাট্য সংঘের নাটক

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মধ্যবিত্ত শ্রেণি, মধ্যবিত্ত জীবনযন্ত্রণা এবং গণনাট্য সংঘের নাটক

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : প্রান্তিক জনজীবন এবং গণনাট্য সংঘের নাটক

প্রতিটি পরিচ্ছেদে বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোতে উল্লেখিত শ্রেণিগুলির উদ্ভব-বিকাশের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য সময়সীমার মধ্যে শ্রেণিগুলির ধারাবাহিক অগ্রগতি এবং গণনাট্য সংঘের নাটকে শ্রেণিচরিত্র ও শ্রেণিসংগ্রামের প্রতিচ্ছবি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শুধুমাত্র চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রেণিচেতনার বদলে প্রান্তিক জনজীবনের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

এই অধ্যায়ে আমরা সেই নাটকগুলি আলোচনা করব যে নাটকগুলিতে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের শ্রেণিচেতনাকে জাগিয়ে তুলে শ্রেণিসংগ্রামের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা

হয়েছে। অধ্যায়ের শেষে যে নাটকগুলিতে শ্রেণিচেতনা ও শ্রেণিসংগ্রামের প্রসঙ্গে এসেছে আমরা তার একটি তালিকা প্রদান করেছি।

#### তথ্যসূত্র :

- SI Karl Marx; Classes, Chapter 52, Capital, Volume iii, (Edited by Friedrich Engels), Progress Publishers, Moscow, p- 885
- V. I Lenin; A Great Beginning, Lenin Collected Works 29, March-August 1919,
  Progress Publishers, Moscow, p- 421
- ৩। আ. ইয়ের্মাকোভা, ভ. রাত্নিকভ; শ্রেণি ও শ্রেণিসংগ্রাম (অনুবাদ- ননী ভৌমিক), প্রগতি প্রকাশন, মক্ষো, ১৯৮৮, পৃ- ৫০
- 8 V. I Lenin; FOREWORD TO THE PUBLISHED SPEECH "DECEPTION OF THE PEOPLE WITH SLOGANS OF FREEDOM AND EQUALITY", Lenin Collected Works 29, March-August 1919, Progress Publishers, Moscow, 1973, p- 380

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

# কৃষি-অর্থনীতি, কৃষক শ্রেণি, কৃষক আন্দোলন এবং গণনাট্য সংঘের নাটক

বাংলার কৃষক শ্রেণি ও কৃষিব্যবস্থার ইতিহাস :

আর্যাবর্ত কাল থেকেই এ-দেশের মাটি-জল-আবহাওয়ার উর্বরতায় উদ্ভূত সোনার ফসল ভারতবর্ষের সমৃদ্ধির দ্যোতক ছিল। বৈদিক যুগের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় সাধারণ কৃষক রাজাকে ফসলের এক ষষ্ঠমাংশ রাজস্ব হিসেবে দান করে জমি ভোগ করতে পারত। বাংলা ও ভারতবর্ষে মুসলিম শাসকদের সিংহাসনে আরোহণ করার পর রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিচারব্যবস্থার পাশাপাশি ভূমিরাজস্ব নীতির একাধিক পরিবর্তন ঘটে। মোগল আমলে সামন্ততন্ত্রেরই বদান্যতায় সৃষ্টি হয়েছিল 'জমিদার' শ্রেণি। যার আক্ষরিক অর্থ ছিল জমির কর্তা বা সহিব-ই-জমিন।<sup>১</sup>

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হয়ে ওঠে। এ-দেশের জনসাধারণ, তাদের সামাজিক জীবনযাত্রা, ভূমি-ব্যবস্থা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ইংরেজ রাজস্ব আদায়ের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতে উঠেছিল। পাঁচশালা বন্দোবস্ত (১৭৭২ খ্রি), বাৎসরিক বন্দোবস্ত (১৭৮৮ খ্রি), দশশালা বন্দোবস্তের (১৭৮৮ খ্রি) ক্রমানুসারী ব্যর্থতার পরেও ইংরেজ গর্ভনর কর্নওয়ালিশ ১৭৯৩ সালের ১ নং রেগুলেশনে বাংলা-বিহার-ওড়িশায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণা করেন। জমিদার-জায়গিরদার-তালুকদারদের বকলম অস্তিত্বকে বংশানুক্রমিক সরকারি স্বীকৃতি দিয়ে ফসল উৎপাদনকারী কৃষককে প্রায় ভূমিদাস প্রজায় পরিণত করা হল। এ-দেশের কৃষিব্যবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ ইংরেজের পক্ষে মধ্যস্বত্বভোগীদের সাহায্য ছাড়া বিরাট শস্যসম্ভারের নাগাল পাওয়া সম্ভব ছিল

না। তাছাড়া ইংরেজের কাছে ভারত শুধু শস্য-উৎপাদক দেশ ছিল না, ছিল পুঁজিজাত পণ্যের বাজার ও মূলধন আদায়কারী দেশ।

রাজস্ব সংক্রান্ত আয় নিশ্চিত করার জন্য জমিদার সম্প্রদায়কে ভূমি-নিরাপত্তা দিয়ে ইংরেজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামক সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। যেখানে জমিদার হলেন প্রভু ও কৃষক তার দাস। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে সামন্ততন্ত্রে জমিদার প্রভু-কৃষক দাস এই পরস্পর-বিরোধী শ্রেণির মধ্যে একটি দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক রয়েছে। যার ফলে জমিদারি আধিপত্য আর কৃষকের প্রতিরোধ দুটি ক্রিয়ার দ্বান্দ্বিক সংঘাতের মধ্যে দিয়ে ইতিহাস অগ্রগতি লাভ করেছে। যে ইতিহাস শুধু শাসক জমিদার রচনা করে না, শোষিত কৃষকও এই ইতিহাসের কর্তা।<sup>২</sup> যে কারণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলন হওয়ার সময়কাল থেকেই বাংলা জুড়ে অসংখ্য কৃষকবিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পরবর্তী এক শতক জুড়ে সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, ওয়াহাবি আন্দোলন, ফরাজি বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ, পাবনার কৃষক আন্দোলনে সমগ্র বাংলোদেশ জ্বলতে থাকে। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল জমিদার-জোতদাররা। এমনকি পাবনা-বণ্ডড়ার কৃষক আন্দোলনে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের ডাক দেওয়া হয়েছিল। বাধ্য হয়ে ইংরেজকে ১৮৮৫ সালে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' বা 'বেঙ্গল টেনাঙ্গি অ্যাষ্ট' পাশ করে একশ্রেণির কৃষককে জমির অধিকার দিতে হয়। একই বছরে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও উত্তরোত্তর জনসমর্থনের ভিত্তিকে কাজে লাগিয়ে ইংরেজ সরকার ক্রমাগত কৃষকবিদ্রোহে রাশ টানতে সক্ষম হয়।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে রায়তদের পনেরো বছর পরে যথেচ্ছ খাজনা বাড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়।<sup>°</sup> যার সুযোগে সম্পন্ন রায়তদের একাংশের হাতে প্রচুর সম্পদ ও জমি কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। কালক্রমে এই মধ্যস্বত্বভোগী ও সম্পন্ন রায়তরাই জোতদার রূপে পরিচিতি লাভ করে। যাদের সমান্তরাল ভূমি-রাজস্ব নীতিতে কৃষককে দখলীস্বত্ব ছাড়া চাষ করানোর পর ফসলের বৃহৎ অংশ খাজনারূপে জমা করতে বাধ্য করা হত। বাংলার ২৮ রকম প্রজাদের মধ্যে এই কৃষকদের নতুন পরিচয় হয় 'বর্গাদার'।<sup>8</sup> ঔপনিবেশিক কাল থেকে ধরলে 'বস্তুত বাংলার কৃষি-ইতিহাসই হচ্ছে বর্গাদারি ব্যবস্থার বিকাশের ইতিহাস।<sup>৫</sup> এদেরকে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক খাজনা 'আধি' হিসেবে

দিতে বাধ্য করা হত এবং জমির অধিকার না থাকায় মর্জিমতো তাদের উচ্ছেদ করা হত। এর সঙ্গে যুক্ত হত বাজে আদায় বা আবওয়াব। সব মিলিয়ে কৃষকদের অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হয়ে উঠেছিল।

জোতদার-মহাজনি চক্রের যাঁতাকল থেকে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত রায়তদেরও রেহাই ছিল না। তারাও অবস্থা-বিপাকে মহাজনদের থেকে উচ্চহারে ঋণ নিত। ঋণ শোধ না করতে পারলে রায়তের জমি নিলামে কিনে তাদের বর্গাদারে পরিণত করত। জমিতে নতুন প্রজাপত্তন করলে খাজনা পেত একর প্রতি ৫-৭ টাকা, কিন্তু বর্গাদারকে দিয়ে চাষ করালে জোতদার একর প্রতি ৪০ টাকা মুনাফা তুলতে পারত।<sup>৬</sup> ১৯৩১ সালে দেখা যায় প্রতি হাজার কৃষকে ৪০৭ জন ভূমিহীন আর বর্গাদারের পরিমাণ কৃষক সমাজের শতকরা কুড়ি শতাংশ। স্বত্ববান রায়ত ৯২ লক্ষ থেকে কমে ৬০ লক্ষ হয়েছে।<sup>৭</sup> জোতদার-মহাজনদের অত্যাচারে সর্বস্ব বিক্রি করে রায়ত কৃষক হল আধিয়ার, আধিয়ার হল ক্ষেতমজুর। ১৯২৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনীতে বর্গাদারদের প্রজা স্বীকৃতি অস্বীকার করে তাদের ক্ষেতমজুর বা ভূমিদাসে পরিণত করা হয়।

### স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে কৃষি পরিস্থিতি :

১৯২১ সালে গান্ধীজির অসহযোগ সত্যাগ্রহ আন্দোলন ভারতবর্ষের বৃহত্তর জনমানসকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। যে কৃষক-শ্রমিককে কংগ্রেসি নেতৃত্ব পঙ্গু-অথর্ব করে রেখেছিল, গান্ধীজির নেতৃত্বে তাদের অন্তরের সম্ভাবনাময় বিপুল শক্তি উদ্গীরণের অপেক্ষা করতে থাকে। চৌরিচৌরার হিংসাত্মক ঘটনার পর গান্ধীজি আন্দোলন প্রত্যাহত করে নিলেও সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাধারণ কৃষকের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের তাৎক্ষণিক বহিঃপ্রকাশ সমগ্র তারতবর্ষের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল।

একই সময়ে ভারতবর্ষে বামপন্থী রাজনীতির উম্বেষ ঘটতে থাকে। ভারতবর্ষ জুড়ে কৃষকদের বিচ্ছিন্ন ও আঞ্চলিক স্বরকে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৩৬ সালের ১১ এপ্রিল লক্ষ্ণৌতে সারা ভারত কৃষক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির পরিচালনায়

১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা গঠিত হয়। ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার দ্বিতীয় সম্মেলনে জমিদারি মালিকানা শেষ করার ডাক দেওয়া হয়।<sup>৮</sup> ১৯৪০ সালে ফ্রান্সিস ফ্লাউডের নেতৃত্বাধীন ভূমি-রাজস্ব কমিশন বা ফ্লাউড কমিশনও এ-দেশের জাতীয় স্বার্থে জমিদারি প্রথা রদ এবং আধির বদলে তেভাগার স্বীকৃতির সুপারিশ করেছিল।<sup>৯</sup> এই রিপোর্টে ভবিষ্যতের গর্ভে অবস্থিত 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' সম্পর্কেও অশনি সংকেত দেওয়া ছিল। স্বভাবতই সরকারি শাসনযন্ত্রের ব্যর্থতা এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের দ্রুত পট পরিবর্তনে কমিশনের প্রস্তাবসমূহ লাল সুতোর ফাঁসে বন্দি হয়ে যায়।

১৯৪২-র আগস্ট মাসে গান্ধীজি 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দেন। যে বিরাট কৃষক-শক্তিকে এতদিন চৌরিচৌরায়, চম্পারণে 'অহিংসা'র অছিলায় নিদ্রিয় করে রাখা হয়েছিল, নেতৃত্বহীন অনিয়ন্ত্রিত সংগ্রামে তার সেই শক্তি বিস্ফোরিত হল। যুক্তপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, ওড়িশা এবং বাংলার মেদিনীপুর অঞ্চলে গেরিলা কৃষকসংগ্রাম গণঅভ্যুত্থানের চেহারা নেয়। মেদিনীপুরের 'স্বাধীন তাম্রলিগু' সরকারের মতো সাতারা, তালচেরসহ বিভিন্ন জায়গায় 'জাতীয় সরকার' গঠিত হয়। মেদিনীপুরের তমলুক, সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, মহিষাদলে নিজস্ব রাজস্ব ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, স্কুল, সৈন্যবাহিনী গঠন করা হয়। এই সংগ্রাম শুধু ইংরেজ বিরোধী ছিল না, কৃষকসমাজের শক্র জমিদার-জোতদারসহ তাদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলিও ছিল কৃষকসমাজের লক্ষ্যবস্তু। আগস্ট-আন্দোলনকে ধ্বংস করতে ইংরেজ নজিরবিহীন অত্যাচার চালায়। আন্দোলনের তীব্রতা কমার সময়েই পঞ্চাশের মন্বন্তেরে আঘাত বাংলার কৃষকসমাজের সমস্ত প্রতিবাদী সত্তাকে নিংড়ে নিয়ে অস্থি-মজ্জাহীন কঙ্গালে পরিণত করে।

#### গণনাট্য সংঘের নাটকে কৃষিব্যবস্থা ও কৃষক আন্দোলন :

বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সূচনা হয়েছিল ১৮৭২ সালে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে। ঘটনাচক্রে 'শখের থিয়েটার'-এর বাবুদের অধিকাংশই ছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে

উদ্ভূত জমিদারশ্রেণির প্রতিনিধি। ফলত ন্যাশনাল থিয়েটারের মঞ্চে 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনয় একটি বৈপ্লবিক ঘটনা। একই সময়ে 'জমিদার-দর্পণ', 'চা-কর দর্পণ', 'কেরাণী দর্পণ'-এর মতো দর্পণ নাটকগুলির রচনা ও মঞ্চাভিনয় নেহাত কাকতালীয় ঘটনা ছিল না। নবাগত আধা-পুঁজিবাদ ও আধা-সামন্ততন্ত্রের দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান বাঙালির সমাজব্যবস্থা প্রতিবর্ত প্রক্রিয়ার মতো এইসব নাটকের জন্ম দিয়েছিল। এই নাটকগুলিতে গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার চিত্র বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হলেও তা মূলত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নিজস্ব শ্রেণিগত কণ্ঠস্বরের অনুরণন।

তিনের দশক থেকে ক্রমানুসারী সমাজ-পরিবর্তনের ডাক ১৯৪৩ সালে বাংলায় গণনাট্য সংঘের জন্ম দিয়েছিল। তৎকালের নাটককারগণ বিশ্ব-রাজনীতির সঙ্গে এক-পংক্তিতে দাঁড়িয়ে বামপন্থী শ্রেণিচেতনার আলোকে বাংলা নাটক ও বাঙালি সমাজব্যবস্থাকে নতুন দিশা দেখাতে চেয়েছিলেন। গণনাট্য সংঘের সূচনালগ্নেই অভিনীত বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' নাটকে দুর্ভিক্ষকালে বাংলার কৃষক-জীবনের মর্মান্তিক দুর্দশার কাহিনি প্রতিভাত হয়েছিল। অবশ্য 'নবান্ন' নাটকের শেষে 'গাঁতায় খাটা' ও প্রধানের 'জোর প্রতিরোধ' ডাকের সারবত্তা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে 'নবান্ন' বা 'জবানবন্দী' গণনাট্য সংঘের প্রথম পর্বের নাট্যাভিনয়। বিজন ভট্টাচার্য ও গণনাট্য সংঘ উভয়ের দৃষ্টিতেই দুর্ভিক্ষ-পরিস্থিতিতে গ্রামের দুঃস্থ কৃষকসমাজের প্রতি সহানুভূতি ছিল, অনুকম্পা ছিল, বৈগ্লবিক আন্দোলনে দীক্ষা দেওয়ার মতো তাত্ত্বিক শ্রেণিশিক্ষাও ছিল; কিন্তু কৃষকদের শ্রেণিসংগ্রামের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং সংঘের তৎকালীন রাজনৈতিক নীতি ও কর্মপন্থা পিছু টেনে ধরেছিল।

অবশ্য আগস্ট আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক সংগ্রামের উদাহরণ 'নবান্ন'-এর স্রষ্টাকারদের সামনে উপস্থিত ছিল। 'নবান্ন' নাটকের প্রথম অঙ্কে দেখা যায় আমিনপুর গ্রামে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের জ্বলন্ত প্রেক্ষাপট। কিন্তু নাটকে দুর্ভিক্ষের ভয়ংকরতার সামনে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষকদের শ্রেণিসংগ্রামের ভূমিকা গৌণ হয়ে উঠেছে। পুলিশের গুলিতে (নাটকে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ) পঞ্চাননী, প্রধানের সন্তানদের মৃত্যু, অত্যাচার, নারীধর্ষণের ঘটনা বুঝিয়ে দেয় আমিনপুর আদতে

মেদিনীপুরের 'জাতীয় সরকার'। নাটকে আমরা দেখি কৃষকদের 'প্ররোচনাদাতা' যুধিষ্ঠিরকে। যাকে কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন 'জনযুদ্ধ' নীতির নিরিখে 'পঞ্চম বাহিনী' বলে চিনে নিতে পারি।

কমিউনিস্ট পার্টির ধারণা ছিল 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন পঞ্চম বাহিনীর দ্বারা অপহৃত হবে।<sup>১০</sup> এই তত্ত্বকে মান্যতা দিলে সাধারণ কৃষকদের লড়াই ও আত্মত্যাগের মহিমাকে অস্বীকার করা হয়। সেই দিক থেকে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তরঙ্গ' নাটকটির মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ কৃষক সমাজের সামগ্রিকতাকে চিহ্নিত করা এবং সাধারণ কৃষকদের লড়াইকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া। লক্ষ্যণীয় নাটকটি গণনাট্য সংঘের উত্তর কলকাতা শাখা দ্বারা প্রযোজিত হয় ১৯৪৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি। অর্থাৎ যে-সময় কমিউনিস্ট পার্টি ও গণনাট্য সংঘ রণদিভে প্রবর্তিত 'ঝুটা স্বাধীনতা'র পথে চালিত হচ্ছে এবং নিষিদ্ধ পার্টির উপর কংগ্রেস সরকারের প্রবল অত্যাচার নেমে এসেছে। এরকম পরিস্থিতিতে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে কমিউনিস্ট-কংগ্রেসি মতাদর্শের মিলিত অবস্থানের কাহিনিকে 'বুর্জোয়া' বলে দাগিয়ে দেওয়া খুব স্বাভাবিক ছিল।<sup>১১</sup> কিন্তু আমরা যদি নাট্যকাহিনি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব নাটককার কংগ্রেসি 'বুর্জোয়া' নেতৃত্ব ও নব সাজে সজ্জিত কমিউনিস্ট আন্দোলনের দুটি ভিন্নমুখী ধারাকে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে জীর্ণ করেননি। দিগিন্দ্রচন্দ্র

'তরঙ্গ' নাটকের শুরুতে বৃহত্তর কৃষক আন্দোলনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। দরিদ্র কাঠমিন্ত্রি গোপাল মণ্ডলের সঙ্গে কৃষক সন্তান মহীউদ্দিনের কথোপকথনে জমিদারি অত্যাচার, তোলাবাজি, ইউনিয়ন বোর্ডের জোরজুলুমের মতো কৃষকসমাজের চিরন্তন সমস্যার চিত্র উঠে আসে। যার বিরুদ্ধে গ্রামের কৃষকসহ সমস্ত মানুষ ধর্মনিরপেক্ষভাবে একত্রিত হয়েছে। স্কুলের ছাত্রদের 'বন্দেমাতরম, আল্লা হু আকবর, ভারত মাতাকি জয়, দেশের তরে মরতে হবে—ফাঁসি কাঠে ঝুলতে হবে' প্রভৃতি ল্লোগানে মুখরিত মিছিল থেকে বাজারে তোলাবাজি প্রথা বন্ধ করার বার্তা প্রচার করা হয়। গ্রামের বড় ভুঁইয়া জমিদার বিপিন তোলাবাজির মূল কাণ্ডারি। যদিও তারই কাকা গান্ধীবাদী নেতা ছোটো ভূঁইয়া শশীবাবু তোলাবাজির জুলুমের বিরোধিতা করেন। তিনি গ্রামবাসীকে স্বাবলম্বী হতে বলেন, ''আমি যা বলব তাই তোমরা করবে কেন! তোমরা দশজনে পরামর্শ করে ঠিক কর কী করবে!''<sup>১</sup>

তোলা বন্ধের মতো আপাতক্ষুদ্র অর্থনৈতিক বিষয় নিয়েও নাটকে কয়েকটি শ্রেণিবিন্যাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যার একদিকে চাযিরা, অন্যদিকে বিপিন, বঙ্গ চক্রবর্তী, সার্কেল অফিসার, দফাদার, কনস্টেবলের মতো সামন্ততন্ত্রের প্রভু ও সরকার কর্তৃক নিযুক্ত রক্ষাকর্তারা। যে কৃষকেরা দৌর্দণ্ডপ্রতাপ ভূঁইয়া জমিদারদের সামনে চিরকাল মাথা নিচু করে কথা বলে এসেছে, আজ তাদের চোখে-চোখ রেখে কথা বলার সাহস বিপিনকে বিস্মিত করে। বিপিনের ধারণা তোলাবন্ধের আন্দোলন সফল হলে কৃষকরা পরবর্তীকালে কর্জার ধান দিতে অস্বীকার করবে। তাই সংঘবদ্ধ আন্দোলনে ভাঙন ধরানোর জন্য সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়ানোর শুরু হয়। গোপালের মেয়ে মঞ্জুরী ও মহীউদ্দিনের স্বাভাবিক বন্ধুত্বকে কলুষিত করতে ধর্মের পেয়াদারা হাজির হয়। কিন্তু গোপাল মণ্ডল ও মহীর দৃঢ়চিত্ততায় তাদের সাম্প্রদায়িক পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

শাসক পুঁজিবাদী হোক বা সামন্ততান্ত্রিক, সর্বহারার বিপক্ষে তাদের চরিত্রের কখনও পরিবর্তন হয় না। এই অশুভ চক্রকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য যে শ্রেণিসচেতন রাজনৈতিক বোধের প্রয়োজন হয়, তার শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য নাটকের তৃতীয় অঙ্কে শশীবাবুর ছোটো ছেলে অমর ও তার বন্ধু নিখিলের আবির্ভাব ঘটে। আজীবন কংগ্রেসি আবহাওয়ায় প্রতিপালিত অমরের রাজনৈতিক চেতনার আমূল পরিবর্তন এসেছে জেলবন্দি অবস্থায়। নব্য বোধিপ্রাপ্ত বামপন্থী চেতনার আলোক গ্রামবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইলে তাকে অনভ্যস্ত বাধা পেতে হয়।

"[অমর ধ্বনি দিল—'ইনক্লাব'। কিন্তু তার ধ্বনিতে কোনো সাড়া মিলল না—কারণ এই ধ্বনিতে তখনও কেউ অভ্যস্ত হয়নি। অনেকে তার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।]

স্পে-ম্যাজি : হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! [অট্টহাসি] এর মানে তো এরা জানে না অমরবাবু। দিন কয়েক রিহার্সাল দিতে হবে।

অমর : [স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের কথা গ্রাহ্য না করে] আপনারা বলবেন—জিন্দাবাদ। বলুন—ইনক্লাব...

#### সমবেত কণ্ঠে : জয়।

স্পে-ম্যাজি : বৃথাই চেষ্টা অমরবাবু। [মৃদু হাস্য]

নিখিল : জয়ই বটে। জিন্দাবাদ মানেই জয়। আপনারা বলুন—জিন্দাবাদ।"<sup>>৩</sup>

তিনের দশকে কংগ্রেসের একাধিক নীতির ব্যর্থতা মানুষকে সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছিল। আবার চারের দশকে 'জনযুদ্ধ'-এর স্লোগানের ব্যর্থতা কমিউনিস্ট পার্টিকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের কংগ্রেস পরিচালিত সর্ববৃহৎ পথটি থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। স্বাধীনতা নয়, স্বাধীনতার পথ হয়ে উঠেছিল আলোচনা তথা বিবাদের মূল লক্ষ্যবস্তু। শশীবাবু সশস্ত্র সংগ্রামের পথ ত্যাগ করে গান্ধীবাদি হয়েছিলেন আর তার পুত্র অহিংস আন্দোলনের ব্যর্থতা অনুধাবন করে শুঙ্খলিত কৃষক-শ্রমিককে লাল পতাকার তলায় জড়ো করতে চায়। যুগ পরিবর্তিত হচ্ছে—সেই নতুন যুগের প্রতিনিধি হল অমর আর নিখিলের মতো তরতাজা যুবক। অবশ্য কৃষকরা নেতৃত্বের আদেশের অপেক্ষা করে না। তাই প্রথমে শশীবাবু ও পরে অমর-নিখিলকে গ্রেপ্তার করা হলে কৃষকরা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে ফেটে পড়ে। সাত রাউন্ড গুলি, কুড়িজন আর্মড ফোর্স দিয়েও তাদের পথ রোধ করা যায়নি। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ঢং-এ তারা থানা আক্রমণ করে, টেলিগ্রাফের তার কেটে দেয়। সেদিনের লড়াই সাধারণ কৃষকদের অনায়াসে শ্রেণিসচেতন করে দেয়। অন্যদিকে গোরা সৈন্যদের বর্বর আক্রমণে প্রতিরোধহীন গ্রাম প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। গোপালের ছেলে নন্দর মৃত্যু হয়। কৈবর্তপাড়ার লোকেরা পালটা প্রতিরোধ গড়ে সশস্ত্র আক্রমণে গোরাদের পরাস্ত করেছে শুনে গ্রামের চাষিরা তাদের দুর্বলতা বুঝতে পারে। পুত্রশোকে কাতর আহত গোপালের যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার তীব্র বাসনা চাষিদের ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্য একত্রিত করে।

তত্ত্বজ্ঞানী অমর বা নিখিলকে বিস্মিত করেছিল কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের শক্তি। অমর বলেছিল, "ইচ্ছে করলে এরা সবই পারে নিখিল। আমরাই এঁদের ইচ্ছাশক্তিকে ভোঁতা করে রেখেছিলাম।" প্রবল অত্যাচার তাদের সমস্ত সহ্যশক্তির বাঁধ ভেঙে দিয়েছে। গোপাল একদিন কংগ্রেস পতাকা পদদলিত হতে দেখে সংগ্রামের প্রার্থনা করেও নিরাশ হয়ে ফিরেছিল। আজ অমরকে বলতে

হয়, "বন্দুক নিয়েই যদি দাঁড়াতে হয়, একটা বন্দুকের কাজ নয় মাইনুদ্দিন—এক সঙ্গে বহু বন্দুক নিয়ে দাঁড়াতে হবে।" পরাজিত যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অমর যে সশস্ত্র 'ভবিষ্যৎ-সংগ্রামের' আশা দেখেছিল, তা কয়েকদিনের মধ্যেই 'তেভাগা আন্দোলন' রূপে বাংলার মাটিতে আছড়ে পড়বে।

#### তেভাগা আন্দোলন ও গণনাট্য সংঘের নাটক :

১৯৪০ সালে কৃষক সভার পাঞ্জিয়া অধিবেশনে প্রথম তেভাগার ঘোষণা করা হয়। ১৯৪১-এ কৃষক সভার মৌভোগ সম্মেলনে তেভাগার ডাক তীব্র হয়ে ওঠে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও সমাগত দুর্ভিক্ষের কথা মাথায় রেখে ১৯৪২-র নলিতাবাড়ি সম্মেলনে জমিদার-জোতদারদের প্রতি মানবিক আবেদন জানানো হয়। ১৯৪৬-র সেপ্টেম্বর মাসে কৃষক কাউঙ্গিল 'এই মরশুমেই তেভাগা'র ঘোষণা করে। বাংলায় আমন ধান কাটা শুরু হয় নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে। অর্থাৎ হাতে মাত্র দেড় মাসের প্রস্তি। সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলা অতিক্রম করে শীতের শিহরণের মধ্যে নিজের অধিকার বুঝে নেওয়ার উত্তাপ গ্রাম থেকে গ্রামে সঞ্চারিত হয়ে যায়। ভারতবর্ষের দক্ষিণে তেলেঙ্গানায় উদ্ভূত কৃষক বিদ্রোহের রণহুষ্কার বাংলার কানেও এসে পৌঁছোয়। ফলস্বরূপ ১৯৪৬-এ ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার আগুনের মৃত্যুসম স্তর্কতার মধ্যে দুর্ভিক্ষ-মহামারিতে শ্বশান হয়ে যাওয়া ধানক্ষেত থেকে ঢোল-নাকাড়া সহযোগে স্লোগান উঠল—'আধি নয়, তেভাগা'।

ডিসেম্বর-জানুয়ারির মধ্যে জোতদারদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ১৩টি জেলার লক্ষ লক্ষ বর্গাদার নিজেদের খোলানে ধান তোলা শুরু করে দেয়। প্রায় সম্পূর্ণ দক্ষিণবঙ্গ, উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, যশোর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে তেভাগা ব্যাপক শক্তি নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ময়মনসিংহ জেলার সুসং-এ হাজং উপজাতির চাষিরা টংক প্রথার বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে। সিলেটে রাজবংশীরা, জলপাইগুড়িতে সাঁওতাল-ওঁরাও উপজাতিরা, রাজশাহীর নাচোলে, ডুয়ার্সের দোমোহানিতে চা শ্রমিকরাও সর্বতভাবে তেভাগার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। নিখিল

ভারত কৃষকসভার প্রতিবেদনে কৃষক সংগ্রামের এই ব্যাপকতা ও তাৎপর্য সম্পর্কে অভিহিত করা হয়, 'unprecedented in sweep and intensity.'<sup>১8</sup>

তেভাগা আন্দোলনের প্রাথমিক সাফল্য ও জনপ্রিয়তায় আতন্ধিত মুসলিম লিগ সরকার ১৯৪৭ সালের ২২ জানুয়ারি 'বেঙ্গল বর্গাদারস্ টেম্পোরারি রেগুলেশন বিল'-এর খসড়া প্রকাশ করে। বিলের সংবাদ প্রকাশ হতেই গুরু হয় 'খোলান ভাঙা' আন্দোলন। যে বর্গাদাররা বাধ্য হয়ে জমিদার-জোতদারের গোলায় ধান তুলে দিয়েছিল, তারা সেই সব গোলাগুলি লুট করা গুরু করে। আদতে বিলের খসড়াটি পেশ করা হয়েছিল তেভাগার মূল আন্দোলনের গতিকে সাময়িকভাবে রুদ্ধ করার জন্য। ইংরেজের ভারতত্যাগের সবুজ সংকেত পাওয়ার সঙ্গেই মুসলিম লিগ ও কংগ্রেস প্রত্যক্ষভাবে সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। মুসলিম লিগ সরকারের উদ্দেশ্য ছিল এই বিলটিকে কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গের বিরাট সংখ্যক মুসলমান কৃষকের বিশ্বাস অর্জন করে জনমতকে স্বপক্ষে টেনে আনা এবং কৃষকদের বন্ধু সেজে হিন্দু জোতদার-জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক মোড়ে ঘুরিয়ে দেওয়া। বর্গাদার আইনের মিথ্যা প্ররোচনায় ও সম্ভাব্য স্বাধীনতার স্বপ্নে তেভাগা আন্দোলন সম্বন্ধে কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সভার মনোভাব কিছুটা শিথিল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বিলটি গেজেটে প্রকাশ করা হলেও আইনসভায় পেশ করা হয়নি। বদলে মুসলিম লিগ পর্যাপ্র সময়টুকু চুরি করে নেয়।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে কমিউনিস্ট পার্টির নবনিযুক্ত সাধারণ সম্পাদক বি টি রণদিভে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে 'ঝুটা' তকমা দিয়ে সশস্ত্র গৃহযুদ্ধের ডাক দেন।<sup>১৫</sup> যার পরিণতিতে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়। অধিকাংশ নেতা জেলবন্দি ও পলাতক হওয়ায় সংগঠনের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। কোনো এলাকায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হলেই সেই এলাকাকে 'মুক্তাঞ্চল' ঘোষণা করা হত।<sup>১৬</sup> যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল কৃষিব্যবস্থার অর্থনৈতিক আন্দোলন রূপে, তাকে আকস্মিকভাবে আংশিক রাজনৈতিক সংগ্রামরূপে ঘোষণা করায় আন্দোলনকারী কৃষকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তেভাগা আগুনের মতো ছডিয়ে পডেছিল। দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কাকদ্বীপে যেখানে গণআন্দোলনের শক্ত বুনিয়াদ ছিল সেখানে অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছিল, পালটা আঘাত করেছিল। বিশেষ করে দরিদ্র, 'অশিক্ষিত' কৃষক রমণীরা যেভাবে অধিকারের প্রশ্নে সম্মুখে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিয়েছে তা বিশ্বের যে-কোনো গণআন্দোলনের সমান্তরাল। ময়মনসিংহের রাসমণি কিংবা চন্দনপিঁডির অহল্যার মতো নারীরা হয়ে উঠেছিলেন কৃষক আন্দোলনের জননেত্রী। তেভাগা আন্দোলনকে দমন করার জন্য রাষ্ট্র অত্যাচারের চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। ১৯৪৭-এর ৪ জানুয়ারি দিনাজপুরের চিরির বন্দর থানার বাজিতপুর গ্রামে পুলিশ খেতমজুর সমীরুদ্দিন ও সাঁওতাল কৃষক শিবরামকে গুলি করে মারে। টঙ্ক প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য হাজং গ্রামের রাসমণি, রবি দাসসহ বহু কৃষককে হত্যা করা হয়। যশোর জেলায় গোর্খা সৈন্য নামিয়ে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। স্বাধীনতার পরেও রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের চেহারা বদলায়নি। জোতদার-জমিদার-মহাজনদের চক্রান্ত ও পুলিশি বুলেটের আঘাতে শত-শত কৃষকের মৃতদেহের রক্তবিন্দু দিয়ে তৈরি হয়েছিল ভারতবর্ষের নতুন ইতিহাস। 'মুক্তাঞ্চল' কাকদ্বীপের চন্দনপিঁড়িতে গুলিচালনা ও গর্ভবতী অহল্যা মা, কংসারি হালদারের মৃত্যু বাংলার কৃষক আন্দোলনের চিরচর্চিত কাহিনিতে পরিণত হয়েছিল। ১৯৫০ সালের মধ্যে দিনাজপুরে ৩৩ জন, জলপাইগুড়িতে ১৪ জনসহ ৭০ জনেরও বেশি হিন্দু-মুসলমান-আদিবাসী, পুরুষ-নারী-শিশু শহীদ হন। গ্রেপ্তার হন ১২০০ জন এবং আহতের সংখ্যা প্রায় ১০০০০।<sup>১৭</sup>

স্বাধীনতার পরে কমিউনিস্ট পার্টির পরিবর্তিত নীতি গণনাট্য সংঘের কার্যক্রমেও 'সংকীর্ণতাবাদী' প্রভাব ফেলেছিল। সংঘের এলাহাবাদ সম্মেলনের ঘোষিত নীতি অনুসারে ধানের ক্ষেতে ফুল ফোটানোর সঙ্গে ধান ফলানোর কাজও শুরু হল। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতে এই সম্মেলনের মূলকথা ছিল,

"কৃষক-মজুর ও নিম্নমধ্যবিত্তের নয়া-গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সঙ্গে পা মিলিয়ে সরকারের পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক হাতিয়ার নিয়ে লড়াই করতে গণনাট্য সংঘ শপথ গ্রহণ করছে।"<sup>>৮</sup>

তেভাগা সংগ্রাম গণনাট্য সংঘের কাছে সংগ্রামী শ্রেণিআন্দোলনের অঙ্গ হয়ে ওঠার প্রথম পরীক্ষা ছিল। অবশ্য শুধুমাত্র তৎকালে নয়, তেভাগা সংগ্রামের আবেগ পরবর্তী কয়েক দশকব্যাপী কৃষক আন্দোলনের শিল্প-সাহিত্যকে অগ্রজের মতো পথ দেখিয়েছে। কৃষক-রমণীর দর্পিত বীরত্ব বা পুলিশের গুলিতে গর্ভবতী অহল্যার মৃত্যুর ঘটনা সংঘের সৃষ্টিসন্তাকে প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত করেছিল। সলিল চৌধুরীর 'কাকদ্বীপ' কবিতায় বা বিনয় রায়ের 'অহল্যা মা তোমার সন্তান জন্ম নিল না' গানে শোকবার্তার সঙ্গেই পালটা লড়াইয়ের প্রতিস্পর্ধা ছড়িয়ে পড়ল। তেভাগা শুধুমাত্র একটি কৃষক আন্দোলন নয়; বরং সাফল্য-ব্যর্থতার উর্ধ্বে উঠে মানুষের সংগ্রাম আবেগসিক্ত লড়াইয়ের নামান্তর রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।

অনিল ঘোষের 'নয়ানপুর' নাটকটি সেই আবেগের 'ছোট্ট, সহজ এক দলিল'।<sup>১৯</sup> নাটকটি ১৯৪৮ সালে উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটিতে প্রথম অভিনীত হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য যে নাটকটির কোনো পাণ্ডুলিপি আজকের দিনে পাওয়া যায় না। একাঙ্ক নাটকটির কাহিনিতে দেখা যায় নয়ানপুর গ্রামের কৃষকরা কমিউনিস্ট কর্মীদের সাহায্যে চোরাকারবারি রোধের লড়াই চালাচ্ছে। ভাগচাষির ছেলে নন্দাই, অক্ষয়, রসিদের নেতৃত্বে গ্রামের কৃষকরা একত্রিত হয়। পুলিশ ও জোতদারদের সন্ত্রাস উপেক্ষা করে তারা রক্তে বোনা ধান পাচার হয়ে যাওয়া থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। জোতদারদের দেড়া-বাড়ি' ধান শোধের নির্দেশ অমান্য করে তারা তেভাগার দাবি জানায়। তারা বুঝতে পারে ন্যায়বিচারের উপায় একটাই—সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ। গুরু হয় সংঘর্ষ। স্বাধীন সরকারের পুলিশের গুলিতে শহীদ হয় তিনজন পুরুষ কৃষক ও আন্দোলনের নেতা নন্দাই-এর স্ত্রী সরলা। কিন্তু কৃষকদের মৃত্যুভয়হীন মানসিকতার সামনে পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। সমবেত জনতার মাঝে সরলার রক্তান্ত দেহ দু-হাতে বয়ে নিয়ে আসে নন্দাই। রক্তে ভেজা শাড়ির একপ্রান্ত ছিঁড়ে নিয়ে সে ঘোষণা করে এই লাল নিশানই আজ থেকে তাদের বাঁচা-মরার লড়াইয়ের প্রতীক। অগ্নিসমা নারীর রক্তান্ত মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে সমগ্র কৃষক সমাজ আমৃত্যু সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করে। নয়ানপুরের ঘটনা সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে।

তেভাগা আন্দোলনের সময় কাকদ্বীপের ডোঙাজোড়ায় গর্ভবতী অহল্যার মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে ননী ভৌমিক 'অহল্যা' নৃত্যনাট্যটি রচনা করেন। তেভাগার পটভূমিকাতেই লেখা হয়েছিল 'ডাক' নাটকটি। সজল রায়চৌধুরী নাটকটি জেলখানা থেকে এসেছিল<sup>২০</sup> জানালেও অনিল ঘোষের মতে অসিত ঘোষালের লেখা 'সাড়া' নাটকটিই 'ডাক' নামে অভিনীত হত।<sup>২১</sup> নাটকে এক ছাঁটাই কর্মী গ্রামে ফিরে তেভাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। পুলিশ এসে অত্যাচার শুরু করলে গ্রামের চাষিরা শ্রমিকটির বামপন্থী স্লোগানে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সলিল চৌধুরীর 'এই মাটিতে' নাটকটিও একই প্রেক্ষাপটে রচিত। এছাড়াও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে গোবিন্দ চক্রবর্তী 'আবাদ' নাটকটি ১৯৫২ সালে প্রযোজনা করেন। কৃষক আন্দোলন নিয়ে গোবিন্দ চক্রবর্তীর 'জনক' নাটকটিও সে-বছরেই মঞ্চস্থ হয়।

১৯৫১ সালে প্রযোজিত সলিল চৌধুরীর 'অরুণোদয়ের পথে' নাটকেও আংশিকভাবে কৃষক আন্দোলনের প্রসঙ্গ এসেছে। নাটকে এক ইনস্পেক্টর ও দুই কনস্টেবল জেল-পালানো কয়েদিকে গ্রেপ্তার করার জন্য গভীর রাতে একটি নদীর পারে এসে উপস্থিত হয়। কয়েদির অপরাধ ছিল স্বাধীন ভারতে সে ধনী-গরিবের ভেদাভেদ মুছে দিতে চেয়েছিল, কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল। বাউলের ছদ্মবেশধারী 'কয়েদি' ইনস্পেক্টরকে বুঝিয়ে দেন যে স্বাধীনতার জন্য মানুষ লড়েছিল সেই স্বাধীনতা আসেনি। তাই কৃষক আন্দোলনের কয়েদি তার গন্তব্যের দিকে এগিয়ে গেলেও ইন্সপেক্টর বাধা দিতে পারেন না। যাওয়ার সময় কয়েদি বলে যায়, ''আবার দেখা হবে অরুণোদয়ের পথে… যেদিন নিচু তলার মানুষরা ওপরে উঠবে আপনাকে মনে রাখবে।"<sup>২২</sup>

কাকদ্বীপের কৃষক আন্দোলনের ঘটনা নিয়ে ১৯৬০ সালে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা ও প্রযোজনায় 'মা' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি ফার্গুসনের 'ক্যাম্পবেল অফ গিলমোর' অবলম্বনে রচিত। নাটকে নির্যাতিত কৃষক জননী নিজের সন্তানকে মৃত্যুমুখে তুলে দিয়েও বলতে পারেন, "কাল রাতে আমি শুধু এক চাষির মা ছিলাম, আজ সকালে আমি এমন একজনের মা যে দুনিয়ার বড় মানুষদের একজন।"<sup>২৩</sup>

#### স্বাধীনতা পরবর্তী ভূমিসংস্কার :

স্বাধীনতা লাভের পর দ্বিখণ্ডিত বাংলার বুকে একের পর এক দুর্যোগ আছড়ে পড়ে। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে যে বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্ত মানুষ পশ্চিমবঙ্গে ধারাবাহিকভাবে আশ্রয় নিচ্ছিল, তাদের পরিস্থিতি নিয়েও রাষ্ট্রের কাছে কোনো নীতি ছিল না। ফলে কৃষি ও অ-কৃষি উভয় ধরণের জমির সমস্যার সমাধান খোঁজা প্রয়োজনীয় ছিল। অন্যদিকে নিষ্ঠুর হাতে তেভাগা দমন করার পরে রাষ্ট্র বুঝে গিয়েছিল যে কৃষকদের প্রাচীন অত্যাচারের দিনগুলিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অতএব ভূমিসংস্কার আইন প্রণয়ন করা সত্বর প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ১৯৫০ সালে 'পশ্চিমবঙ্গ বর্গাদার আইন' প্রবর্তন করে। আইনে তেভাগার দাবি স্বীকার করে নিলেও বলা হয় বর্গাদার যদি মালিক বা জোতদারের থেকে লাঙল, বীজ, সার নিয়ে চাষ করে তবে ফসলের অর্ধাংশ দিতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জোতদাররা জোর করে 'চাষের খরচ' পেয়েছি লিখিয়ে ফসলের অর্ধেক তুলে নিয়ে ভাগচাষিকে বঞ্চিত করত।<sup>২8</sup> ১৯৫৩ সালে প্রবর্তিত হয় জমিদারি অধিগ্রহণ আইন। আইনের উপধারা ৪ (৬)-এ বলা হয় যে ১৯৫৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে জমিদার বা মধ্যস্বত্বাধিকারীকে সরকারের হাতে জমি সমর্পণ করতে হবে। নতুবা সরকার বিশেষ আইন প্রয়োগ করে জমি অধিগ্রহণ করবে।<sup>২৫</sup> জমির মালিক কত জমি কোন উদ্দেশ্যে রাখতে পারবে তার সীমা বেঁধে দেওয়া হল : কৃষিজমি ২৫ একর, অকৃষি ও বাস্ত ২০ একর, মাছের ভেরি, বাগান ও ধর্মীয়-দাতব্য সম্পত্তির ঊর্ধ্বসীমাহীন।<sup>২৬</sup> জমিদারি হস্তান্তরিত হওয়ার পর মালিক জমি থেকে প্রাপ্ত মোট আয়ের উপর ক্ষতিপূরণ পাবে। এই আইন অনুযায়ী সরকারি কোষাগার থেকে প্রায় দেড়শো কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল।<sup>২৭</sup> অবশ্য অধিকাংশ মালিকই ক্ষতিপূরণের বদলে জমি ছাড়তে চায়নি। সরকারি নির্দেশকে বোকা বানিয়ে বিভিন্ন কৌশলে তারা জমি লুকিয়ে রাখত। পরিবারের সদস্যদের নামে সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত জমির স্বত্বলিপি তৈরি করার আইনি পদ্ধতি তো ছিলই। অনেকক্ষেত্রেই কাল্পনিক প্রজা তৈরি করে বেনামি জমি বিলি করে সর্বোচ্চ সীমা নিয়ন্ত্রণ করত। প্রচুর জমিজমা দেবোত্তর সম্পত্তি করে অর্থাৎ দেবতাকে সমর্পণ করে দখলে রাখা হত। সরকারি হিসেবে বলা হয়েছিল ১৯৫৫-র মধ্যে ছয় লক্ষ একর জমি অধিগ্রহণ করা সম্ভব হবে। অথচ

১৯৬৭ সাল পর্যন্ত সমর্পণ করা মোট জমি ছিল ৩,৫০,০০০ একর।<sup>২৮</sup> স্পষ্টতই অনুমান করে নেওয়া যায় ১৯৬৭ সালের পূর্বে বাংলায় জমিদাররা কত লক্ষ লক্ষ একর বেআইনি জমির মালিক ছিল।

জমিদারি অধিগ্রহণ আইন বলবৎ হওয়ার পর সাধারণ বর্গাদারকে সরাসরি জমির অধিকার দেওয়া হয়নি, বরং তাদের জমি থেকে উচ্ছেদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আইনের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হয়েছিল ১০০ বিঘার বেশি জমিতে ভাগচাষ করলে সরকার ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমি অধিগ্রহণ করবে।<sup>২৯</sup> আইনের জনহিতকর অর্থটিকে বিকৃত করে জমিদাররা ১০০ বিঘার অতিরিক্ত জমির ভাগচাষিদের উচ্ছেদ করা শুরু করে। ১৯৫৫ সালে 'পশ্চিমবঙ্গ ভূমি-সংস্কার আইন' প্রণয়ন করা হয়। এই আইনে বলা হয় যে বর্গাদার হতে হলে একজন চাষিকে অন্যের জমি চাষ করতে হবে এবং মালিকের অনুমোদন না থাকলে কেউ বর্গাচাষ করতে পারবে না।<sup>৩০</sup> ৪ নং ধারায় বলা হল 'পার্সোনাল কাল্টিভেশন' হিসেবে নথিবদ্ধ জমিতে বর্গাচাষ করানো শান্তিযোগ্য অপরাধ রূপে গণ্য হবে।<sup>৩১</sup> এ-ক্ষেত্রে জমির মালিক বর্গাচাষিকে দিয়ে সারাবছর ফসল ফলিয়ে শেষে মিথ্যা সাক্ষী প্রস্তৃত করে প্রমাণ করত যে মালিক নিজে ফসল ফলিয়েছে। কারণ ১৭ নম্বর ধারায় স্পষ্ট বলা হয়েছিল বর্গাদার যদি নিজে চাষ না করে তবে মালিক বর্গাদারকে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারবে।<sup>৩২</sup>

পাঁচ-ছয়ের দশকে গণনাট্য সংঘ কৃষক আন্দোলনকে ভিত্তি করে যে নাটকগুলি প্রযোজনা করেছিল তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভূমিসংস্কার আইনের ব্যর্থতাকে তুলে ধরে আন্দোলনের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া। ১৯৫৯ সালে প্রযোজিত মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'আমার মাটি' নাটকটিতেও সেই প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়। নাটকের কাহিনিতে দেখা যায় জোতদার রতন বিশ্বাস ও মহাজন শ্রীপতি সামন্ত প্রতি বছরের মতো এবারেও ভাগচাষি হাজারি মণ্ডলসহ অন্যান্য কৃষকদের সর্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছে। রতন বিশ্বাস সুবল নামের আরেক ভাগচাষিকে প্রলোভন দেখিয়ে টিপসই দিয়ে সাক্ষ্যদান করতে বলে যে বিলের জমি হাজারি চাষ করেনি। যেহেতু বর্তমানে গ্রাম জুড়ে সরকারি লোকের দ্বারা জমি জরিপের কাজ চলছে তাই জমিদারি বাঁচানোর জন্য রতন ক্রমশ মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু কৃষকরা এখন সমিতির সাহচর্যে আইন সম্বন্ধে অনেক বেশি সচেতন এবং সংঘবদ্ধ। তাই হাজারি বুঝতে পেরেছে রতনের পরিকল্পনার কারণ,

"ঐ যে কি আইন হয়েচে না—নোকে—ইর বেশি আর জমি রাখতি পারবে না—এখন যদি ভাগরার সব জমি রতন ছিপতির নামে বেওজড় রেকোড হয়ে যায় তালি মলাম।"<sup>৩৩</sup>

এদিকে কর্জা ধানের সুদ মেটাতে গ্রামের সকলে না খেতে পেয়ে মরতে বসেছে। লোকে গরু, লাঙল, থালাবাসন বেচে দিচ্ছে; বলাইয়ের বৌ কিছুদিন আগেই আত্মহত্যা করেছে। হাজারি ও তার প্রতিবেশী শশীও গতবছরের বীজধান, লাঙল কেনার জন্য রতন-শ্রীপতির কাছে দেনাগ্রস্ত। খবর আসে রতন বিশ্বাস সরকারি সম্পত্তি বারালি তলা, ভাগাড়, শ্মশান, বড় দিঘি নোটিশ টাঙিয়ে নিজের নামে করে নিয়েছে। ক্ষিপ্ত কৃষকরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয় 'তোলব না ধান উদির খামারে—'।

কিন্তু শতকের পর শতকব্যাপী জমিদার-জোতদার-মহাজনদের অত্যাচার ও প্রবঞ্চনার নিগড় ভাঙার জন্য শুধুমাত্র মৌখিক প্রতিজ্ঞা যথেষ্ট ছিল না। রতন বিশ্বাসদের আস্তিনের হরেক রকম তাসের জুয়াচুরি হাজারির মতো সরল কৃষকদের অনায়াসে ফাঁদে ফেলতে পারে। প্রতিবাদের দুই মুখ হাজারি ও শশীর ছেলে বৃন্দাবনের মধ্যে ভেদ তৈরি করার জন্য রতন রটিয়ে দিয়েছিল যে হাজারির বিলের জমি শশী চষেছে। অর্থাৎ সরকারের কাছে স্বত্বলিপির দাবিদার হাজারি নয়, শশী। রতন পেয়াদাকে ঘৃষ দিয়ে হাজারির বন্ধকী ভিটেমাটি ডিক্রি জারি করে দখল করে নেয়। হাজারির সামনে কান্নায় ভেঙে পডা ছাডা আর কোনো উপায় থাকে না. ''এ যে আমার দেবতার থান–এ যে আমার স্বগ্গ।" রতনের ধান লুঠে বাধা দেওয়ায় লেঠেল ও পুলিশ পাঁচু মণ্ডল নামে এক কৃষককে হত্যা করে। নিজের শেষ সম্বল জমিটুকু বাঁচাতে ও যমুনার নিরাপত্তার কথা ভেবে হাজারি সাক্ষ্য দেয় যে বৃন্দাবন পাঁচুকে খুন করেছে। সমস্ত সংগ্রামী কৃষক যখন হাজারির 'বিশ্বাসঘাতকতা' নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে জীর্ণ, বৃন্দাবনের গ্রেপ্তারের পর নেতৃত্বহীন, তখন রতন শশীসহ গ্রামের অন্য চাষিদের জমিতে আক্রমণ করে। সেই সময়ে কৃষকদের নেতৃত্ব দেয় 'বিশ্বাসঘাতক' হাজারি মণ্ডল। তার সাহসের বলেই কৃষকরা রতন-শ্রীপতির পরিকল্পনা আটকাতে সফল হয়। নাটকের শেষে মৃতপ্রায় হাজারি উচ্চারণ করে, "ঐ রতন…ঐ শ্রীপতি…উরা আমাদের মদ্দি ঝগড়া বাঁধিয়ে দিয়ে ধান কেটে নিতি চায়লো। উরা আমাদের শত্তুর শত্তুর"।<sup>৩8</sup>

শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অন্নপূর্ণার দেশে' নাটকটি ১৯৬৫ সালে প্রযোজিত হয়। যদিও তার পূর্বে অর্থাৎ ১৯৬৪ সালে দেশীয় রাজনীতির অগ্নিগর্ভ সময়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙন ধরে। বাংলায় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থনে ভগ্ন গণনাট্য সংঘেও পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। নাটককার নাটকের বামপন্থী চরিত্রের সংলাপ বা তাদের কার্যকলাপের সঙ্গে চিন-ভারত যুদ্ধ, 'চিনের দালাল', ভারতরক্ষা আইনের প্রসঙ্গ এনে বামবিরোধী কুৎসার জবাব দিয়েছেন। নাটকটি খাদ্যসংকটকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও তার অন্যতম মূল কারণ রূপে ভূমিসংস্কার নীতির ব্যর্থতার কথা উঠে এসেছে। স্থানীয় কমিউনিস্ট নেতা নিতাই মণ্ডল ভাগচাষ আইনের (ভূমিসংস্কার আইন) সাহায্য নিয়ে জোতদার-মহাজন শ্রীমন্ত সাঁধুখার বিরুদ্ধে মামলা করেছে। শ্রীমন্ত জানে ''আমি নিজে চাষি নই। ভাগচামের নতুন আইন অনুযায়ী জমির ফসলে আমার কোনো হক্ নেই।'' তাই জমিতে তিনদিন ধরে পুলিশি পাহারা বসিয়ে কৃষকদের প্রাপ্য ফসল থেকে বঞ্চিত করতে চায়। আরেক জোতদার গোলকপতির মনে হয় জমিদারি আইন চালু করে কংগ্রেস সরকার কমিউনিস্টদের মতো আচরণ করছে। নিতাইয়ের নেতৃত্বে চাযিরা ঠিক করেছে মহাজনদের ফসল দেবে চারভাগের একভাগ। শ্রীমন্তর মতে,

"দেশে এখন দুটো জাত। এক আমরা, যারা দুটো খেয়ে-পরে আছি। আর ও-ই নিতাই মণ্ডলরা, আমাদের খেতে দেখে যাদের চোখ টাঁটায়..."<sup>৩৫</sup>

নিতাই মণ্ডলদের চোখ টাঁটায় না, কিন্তু ঘরে অভুক্ত শিশুসন্তানের মুখে দুটো খাবার তুলে না দিতে পারলে কষ্টে বুক ফেটে যায়। নিতাই অভিযোগ করে, ''আপনারা পুলিশরা আর এই মহাজনরা মিলে দেশটার কী হাল করেছেন!'' তাই নন্দ তার মেয়ে পুঁটির জন্য গোলকপতির বাড়ি থেকে ভাত 'চুরি' করতে বাধ্য হয়। যে নন্দ একদিন কৃষকদের সঙ্গে বেইমানি করে গোলকপতির ছত্রছায়ায় এসেছিল, আজ তার অভাবের দিনে নিতাইরা ছাড়া কেউ নেই। নন্দ মৃত্যুপথযাত্রী মেয়ের কথা ভেবে পুলিশের অত্যাচারের সামনেও মিথ্যা সাক্ষী দিতে রাজি হয় না। নিতাইয়ের মতো সে বুঝে গেছে, ''আপনাদের অত্যাচারই আমাদের মুক্তির ধ্রুবতারা।''

সিপিআই(এম) এই সময় থেকে কৃষক আন্দোলনকে অর্থনৈতিক সংগ্রামের বদলে রাজনৈতিক সংগ্রাম রূপে দেখতে শুরু করে। রাজনৈতিক সংগ্রাম বলতে এ-ক্ষেত্রে সংসদীয় রাজনীতি। ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকে সিপিআই(এম)-এর তাত্ত্বিক অবস্থান নিয়ে পার্টির মধ্যে আবার মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্টের আমলেই শিলিগুড়ির নকশালবাড়ি অঞ্চলে কৃষক-আন্দোলন শুরু হয়। যাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়ে মালিকদের থেকে জমি কেড়ে ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা। সদ্য সংসদীয় ক্ষমতায় আসীন সিপিআই(এম) স্বাভাবিকভাবেই অতি-বাম রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত ছিল না। একাধিক যুক্তফন্ট সরকারের পতনের পর ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্টের আমলে 'অপারেশন বর্গা'-র প্রক্রিয়া শুরু হয়। পুরো সাতের দশক জুড়ে বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে কৃষিব্যবস্থাতেও পরিবর্তন আসে। পার্টি সংগঠিত গণনাট্য সংঘসহ অন্যান্য নাট্যদলগুলির প্রযোজনায় কৃষক আন্দোলন আবার জীবন্ত হয়ে ওঠে। নাটকে ফিরে আসে তেভাগার স্মৃতি, অহল্যা মায়েরা বহু নামে পুনর্জীবিত হয়ে ওঠেন। অধিকাংশ ক্ষেত্র ক্লোগানধর্মিতা নাটকের সর্বস্ব হয়ে উঠলেও গণনাট্য সংঘ তার সেদিনের রাজনৈতিক ভূমিকাটুকু পালন করেছিল।

#### তথ্যসূত্র :

১। পরিমল বন্দ্যোপাধ্যায়; ভূমি ও ভূমিসংস্কার সেকাল একাল, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭, পৃ- ২৯

২। পার্থ চট্টোপাধ্যায়; কৃষক বিদ্রোহ ও রাষ্ট্রবিপ্লব, ইতিহাসের উত্তরাধিকার, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০, পৃ- ৩৭

৩। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়; গ্রামবাঙলার গড়ন ও ইতিহাস, অনুষ্টুপ, ২০১৭, পৃ- ৯৭

৪। প্রাগুক্ত, ভূমি ও ভূমিসংস্কার সেকাল একাল, পৃ- ৭৩

- ৫। তরুণ রায়; তেভাগা-তেলেঙ্গানা-নকশালবাড়ি, তিন দশকের গণআন্দোলন (সম্পাদনা- অনিল আচার্য), অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২০১৮, পূ- ১২৩
- ৬। প্রাগুক্ত, ভূমি ও ভূমিসংস্কার সেকাল একাল, পৃ- ১০৪

৭। শান্তিপ্রিয় বসু; বাংলার চাষি, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ, পৃ- ৩৯-৪৫

৮। আবদুল্লাহ রসুল; কৃষক সভার ইতিহাস, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৮০, পৃ- ৫৬-৫৭

৯। প্রাগুক্ত, ভূমি ও ভূমিসংস্কার সেকাল একাল, পৃ- ১০৩

- ১০। অনিল বিশ্বাস (সম্পাদনা); বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯, পু- ৭৭
- ১১। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; নাট্যচিন্তা শিল্পজিজ্ঞাসা, ইম্প্রেসন সিন্ডিকেট, ১৯৭৮, পৃ- ৩৫৮

১২। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; তরঙ্গ, পুস্তকালয়, ১৯৪৭, পৃ- ১৯

১৩। তদেব, পৃ- ৬১

১৪। সুনীল সেন; ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ অধ্যায়, চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, ১৯৮৯, পৃ- ৪৯ ১৫। অনিল বিশ্বাস (সম্পাদনা); সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল

ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, দ্বিতীয় খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯, পৃ- ৭৬ ১৬। প্রাগুক্ত, সংকীর্ণতাবাদী হঠকারী লাইনের বিরুদ্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির আত্মসমালোচনা,

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ- ১৯৪

১৭। জয়ন্ত ভট্টাচার্য; বাংলার তেভাগা-তেভাগার সংগ্রাম, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৯৬, পৃ- ৪৯

১৮। প্রাগুক্ত, হেমাঙ্গ বিশ্বাস; অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক যুক্তফ্রন্টের স্বরূপ ও সমস্যা, তিন

দশকের গণআন্দোলন, পু- ৩৮

১৯। অনিল ঘোষ; নয়ানপুর, গণনাট্য পত্রিকা, ৪৮ বর্ষ, মার্চ-এপ্রিল ২০১১, পৃ- ১০২ ২০। সজল রায়চৌধুরী, গণনাট্য কথা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ- ৮৫ ২১। অঞ্জন বেরা; পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ : পর্ব থেকে পর্বান্তর, গণনাট্য প্রকাশনী, ২০১৭, পৃ- ৯৬

২২। সলিল চৌধুরী; অরুণোদয়ের পথে, বিশ্বের গণ-আন্দোলনের নাটক (সম্পাদনা- সুনীল দত্ত), জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ, পৃ- ২৭

২৩। প্রাগুক্ত, গণনাট্য কথা, পৃ- ১৯৬

- ২৪। প্রাগুক্ত, ভূমি ও ভূমিসংস্কার সেকাল একাল, পৃ- ১১২
- ২৬। অনিল বিশ্বাস (সম্পাদনা); জমিদারি-ক্রয় বিলের আসল চেহারা, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, তৃতীয় খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৮, পৃ-

৫৬

২৭। প্রাগুক্ত, ভূমি ও ভূমিসংস্কার সেকাল একাল, পৃ- ১৫৯

২৮। তদেব, পৃ- ২৩৪

২৫। তদেব, পৃ- ১৪১

২৯। মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত (সম্পাদনা); পশ্চিম বাংলার কৃষকের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ও অন্যান্য দাবি, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, অষ্টম খণ্ড, মনীষা, মে ২০১২,

পৃ- ১৪৭

৩০। প্রাগুক্ত, ভূমি ও ভূমিসংস্কার সেকাল একাল, পৃ- ২৭৯

- ・> The West Bengal Land Reforms Act, 1955. (Chapter II.—Raiyats.—Section 4.)
  [X of 1956.] P- 591
- ৩২। The West Bengal Land Reforms Act, 1955. (Chapter HI,—Bargadars.—Section 17.), P- 626
- ৩৩। মনোরঞ্জন বিশ্বাস; আমার মাটি, পুস্তকালয়, ১৯৬০, পৃ- ৫

৩৪। তদেব, পৃ- ১০৬

৩৫। শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়; অন্নপূর্ণার দেশে, গণনাট্য পত্রিকা, ২ বর্ষ, জানুয়ারি ১৯৬৬, পৃ- ৫২

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# শ্রমিক শ্রেণি, শ্রমিক আন্দোলন এবং গণনাট্য সংঘের নাটক

স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণি ও শ্রমিক আন্দোলন :

ইউরোপে পুঁজিবাদ এসেছিল রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের মৃত শরীর অতিক্রম করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবে ইংল্যান্ডসহ সমগ্র ইউরোপের সামন্ততন্ত্র পতনের পর নব আবির্ভূত ধনতন্ত্রের পুঁজি বিস্তারের জন্য উপনিবেশ তৈরির পরিকল্পনা শুরু হয়। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পর ইংল্যান্ডের কাছে ভারতবর্ষ পুঁজিবাদের প্রধান শোষণযন্ত্র হয়ে ওঠে। অথচ ইংল্যান্ডের পথ ধরে ভারতবর্ষে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ঘটে পুঁজিবাদী সভ্যতার বিকাশ হয়নি। প্রাচীন অর্থনীতির কাঠামো ভেঙে সেখানে ঔপনিবেশিক শোষণ ও ভারতীয় সম্পদের নির্গমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংল্যান্ডের শিল্প-বিকাশের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য ১৮৫৩ সাল থেকে ভারতবর্ষে রেলপথের বিস্তার কার্য শুরু হয়। সুকোমল সেনের মতে,

"এই রেলপথ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভব হল আধুনিক শ্রমিকশ্রেণি। রেলপথ নির্মাণে যে শতশত ভারতীয় শ্রমিক নিযুক্ত হলেন তাঁরাই হলেন ভারতে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণির অগ্রদূত।"<sup>3</sup>

ভারতবর্ষে ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে এদেশীয় দালাল, মুৎসুদ্দি, ব্যক্তিগত সচিব, দোভাষী ও ধনী জমিদারদের অর্থ পুঁজিবাদের বল্পাহীন অশ্বমেধের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ওঠে। কাঁচামাল থেকে শিল্পজাত পণ্য প্রস্তুত করার জন্য কলকাতা ও তৎ-সংলগ্ন অঞ্চলে কলকারখানা

প্রতিষ্ঠিত হওয়া শুরু হয়। অন্যদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে আগত মানুষেরা হয়ে ওঠে শিল্পব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি। শহরকেন্দ্রিক কল-কারখানাকে কেন্দ্র করেই বাংলা তথা ভারতবর্ষের শ্রমিক সুসংঘবদ্ধভাবে 'শ্রেণি' রূপে গড়ে ওঠা শুরু করে।

পুঁজিবাদী সভ্যতার দানবীয় বিকাশ অব্যাহত রাখতে শ্রমিকশ্রেণির উপর অকথ্য অত্যাচার দস্তুর হয়ে উঠেছিল। অত্যাচারের তীব্রতার সঙ্গে সাধারণ শ্রমিকের একত্রিত প্রতিবাদও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ-প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়বে ১৮৭১ সালে 'প্যারি কমিউনের লড়াই' বা ১৮৮৬ সালের ১ মে আমেরিকায় 'ঐতিহাসিক মে দিবস'-এর সংগ্রাম। ১৮৬৪ সালে গড়ে উঠেছিল 'ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেনস অ্যাসোসিয়েশন'। যার অন্যতম উদ্যোক্তা কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে ইউরোপে পুঁজিবাদী অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদকে রাজনৈতিকভাবে সংজ্ঞায়িত করেন। তাঁদের 'ডাস ক্যাপিটাল' গ্রন্থে জন্ম হয় কমিউনিজম নামক এক নতুন রাজনৈতিক তত্ত্বের। তাঁরা দেখালেন ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনী শক্তির মূল কারিগর হয়েও শ্রমিকশ্রেণির হাতে উৎপাদনের উপাদান সমূহের অধিকার নেই। যার মালিক বুর্জোয়া শ্রেণি। উৎপাদন-সম্পর্ক কেন্দ্রিক পরস্পরবিরোধী শ্রেণি-বিন্যস্ত সমাজে প্রকৃত রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের একমাত্র পথ শ্রেণিসংগ্রাম। ১৮৭১ সালের ২৩ নভেম্বর Friedrich Bolte-কে পাঠানো একটি চিঠিতে কার্ল মার্কস শ্রমিক আন্দোলনকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুভাবে বিভক্ত করেন 👌 অর্থনৈতিক সংগ্রামের দিক থেকে প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায় 'উদ্বৃত্ত মূল্য'-এর তত্ত্ব। একজন শ্রমিকের শ্রম দ্বারা সৃষ্ট শ্রমশক্তির মূল্যের অতিরিক্ত মূল্য ও পুঁজিপতির লভ্যাংশের মূল্যকে আমরা 'উদ্বৃত্ত মূল্য' বলতে পারি।<sup>°</sup> অর্থনৈতিক সংগ্রামে শ্রমদিবস হ্রাস ও কর্মনিরাপত্তার দাবিতে আন্দোলন করে 'উদ্বত্ত মূল্য'-কে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। শ্রমিকশ্রেণিকে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলন করার জন্য মার্কস ও এঙ্গেলসের 'ট্রেড ইউনিয়ন' সংগঠিত করার নির্দেশ লেনিনের হাতে বাস্তব রূপ লাভ করে। এই সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণির সব থেকে বড় অস্ত্র হবে ধর্মঘট। প্রতিটি ধর্মঘটের আঘাত পুঁজিবাদের ভিত নড়িয়ে দেবে এবং ধারাবাহিক ধর্মঘটের মাধ্যমে সমাজের সর্বহারা শ্রেণির মধ্যে বিপ্লবের বীজ রোপিত হবে।<sup>8</sup>

১৯১৭ সালে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের পর ভারতবর্ষের মাটিতেও বামপন্থী রাজনীতির বিকাশ ও শ্রেণিসংগ্রামের ভাবনা প্রচারিত হতে শুরু করে। ভারতে শ্রমিকশ্রেণির অসন্তোষ বা রাজনৈতিক ঘটনার সমর্থনে শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের ইতিহাস অব্যাহত থাকলেও তাতে তাত্ত্বিক বামপন্থী দৃষ্টিকোণ ছিল না। শ্রমিক ধর্মঘটের মধ্যেও রাজনৈতিক শ্রেণিসংগ্রামের ভাবনা অনুপস্থিত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের মাটিতে ট্রেড ইউনিয়নের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মাধ্যমে শ্রমিক আন্দোলনের দৃঢ়ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। ১৯২০ সালে লোকমান্য তিলক ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসি নেতৃত্বের হাত ধরে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। একই সময়ে মানবেন্দ্রনাথ রায়দের নেতৃত্বে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিরও প্রতিষ্ঠা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে (১৯৩৯-৪৫) সারা ভারত জুড়ে ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘট তীব্র চেহারা নেয়। এই সময়কালে প্রতিবছর গড়ে ৬০০টি ধর্মঘট হয়। প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ শ্রমিক প্রতিবছর ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে এবং প্রতি বছর বিনষ্ট শ্রমদিবসের সংখ্যা চল্লিশ লক্ষ দিন।<sup>৫</sup> দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতের বলপূর্বক অংশগ্রহণের প্রতিবাদে মুম্বই-এ শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। ১৯৪২-এ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে গান্ধীজির গ্রেপ্তারের পর ভারতের বড় কারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘট গুরু করে। টাটা ইস্পাত কারখানা ১৩ দিন বন্ধ থাকে। আহমেদাবাদের সুতাকল বন্ধ ছিল সাড়ে তিন মাস।<sup>৬</sup> যদিও অধ্যাপক সুমিত সরকারের মতে কলকাতায় কমিউনিস্টরা 'জনযুদ্ধ' নীতির জন্য শ্রমিকদের আন্দোলনের রাশ টেনে ধরে রেখেছিল।<sup>৭</sup> এই সময়কালে শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে ধর্মঘটের প্রয়োজনীয়তা ও ট্রেড-ইউনিয়নের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে গুরু করলেও কমিউনিস্ট পার্টি তার ফসল তুলতে পারেনি। ১৯৪৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পার্টির বিশ্লেষণ,

"পার্টি সভ্যদের মধ্যে শতকরা ১০ জন শ্রমিক। শ্রমিকদের মধ্যে পার্টির গণভিত্তি বাড়ছে।

কিন্তু পার্টি যখন শ্রমিকের পার্টি তখন এই অনুপাত আমাদের পক্ষে লজ্জারই কথা।"<sup>৮</sup> কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকাকালীন সদস্যরা কংগ্রেস ও সোশ্যালিস্ট পার্টির শ্রমিক সংগঠনের আড়ালে কাজ করত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ব্যাপক পরিবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হয়। যুদ্ধের পরে লক্ষ লক্ষ লোক কাজ হারায় এবং দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস করা হয়। ফলস্বরূপ ১৯৪৬ সালে ১৬২৯টি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারী শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ এবং প্রায় দেড় কোটি শ্রমদিবস নষ্ট হয়।<sup>৯</sup> শুধুমাত্র কলকাতা ও শহরতলিতেই পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করেন। নৌবিদ্রোহ, আজাদ হিন্দ বাহিনীর মুক্তি আন্দোলন, রশিদ আলি দিবসেও শ্রমিকদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাস জুড়ে চলা ডাক-তার বিভাগ আন্দোলনের মূল প্রতিবাদ ছিল নিম্নস্তরের বেতন ও চাকরির নিরাপত্তাহীনতার বিরুদ্ধে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বমুহূর্তে ভারতের উত্তাল রাজনৈতিক বাতাবরণ এবং সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলির মিলিত সমর্থন ডাক-তার বিভাগের আন্দোলনের গুরুত্ব অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছিল।

১৬ আগস্ট থেকে শুরু হয় ভ্রাত্যাতী দাঙ্গা। ১৯৪৬-র প্রথমার্ধ জুড়ে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে কলকাতার রাজপথের দখল নিয়েছিল ছাত্র-শ্রমিক-মধ্যবিত্তের বিপ্লবী পদচালনা, অথচ আগস্টেই সেই রাজপথ ভিজে উঠল ভ্রাত্যাতী দাঙ্গার রক্তাক্ত অভিশাপে। ধর্মীয় বিভাজনকে কেন্দ্র করে শ্রমিকের ঐকমত্যেও চিড় ধরে। দাঙ্গার বিভাজনকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই শুরু হয়। লক্ষ্মী জুটমিলের আন্দোলন, পোর্ট ট্রাস্টের আন্দোলন, নারকেলডাঙার মেটাল ওয়াকার্সদের আন্দোলন দাঙ্গার অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায়। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে কলকাতার শ্রমিকদের দাঙ্গা প্রতিরোধ করার ডাক দেওয়া হয়। দাঙ্গাবিরোধী শক্তিরূপে ট্রামশ্রমিকদের ঐক্য সেই সময়ে উজ্জ্বল ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু বছর ঘুরতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে গুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণির ঐক্যের ভরসায় 'জাতীয় ঐক্য'-এর অখণ্ডতা রক্ষা সম্ভব নয়। 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' থেকে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'—ভারতবাসীর অন্ধকার প্রকোষ্ঠের সাম্প্রদায়িক ডাক দেশভাগ অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। যার সূত্র ধরে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দ্বিখণ্ডিতভাবে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়।

স্বাধীনোত্তর বাংলায় শ্রমিক আন্দোলন ও গণনাট্য সংঘের নাটক :

ভারতের স্বাধীনতালাভ নতুন স্বপ্নের যে আলোকবর্তিকা আকাশে তুলে ধরেছিল, তার তলায় জমে থাকা অন্ধকারে সাধারণ মানুষের জীবন দমবন্ধ হয়ে এসেছিল। একদিকে দাঙ্গাবিধ্বস্ত জীবন ভুলতে চেয়ে উদ্বাস্ত মানুষের ঢল, অন্যদিকে ফসলের অধিকারে লড়তে চাওয়া তেভাগার কৃষকদের উপর নেমে আসা সরকারি পুলিশের গুলিচালনা। স্বাধীনতালাভের দিনটিতেই শ্রীদুর্গা কটন মিলে শুরু হল ছাঁটাই। তার প্রতিবাদে শ্রমিকরা ধর্মঘটে শামিল হলে ৬০০ জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়। দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের পর শ্রমিকরা তাদের প্রাপ্য জয় ছিনিয়ে দেয়।<sup>১০</sup> একই ঘটনা ঘটেছিল বাসন্তী কটন মিলে, ব্রুকবন্ড কারখানায়। নভেম্বর মাসে একটি সরকারি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে কারখানার 'সত্যাগ্রহ' ও অবস্থান ধর্মঘটের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হাঁশিয়ারি দেওয়া হয়। এআইটিইউসি-র একটি সমাবেশে শ্রমিকরা স্বাধীন ভারতবর্ষের শ্রমনীতি পরিবর্তনের দাবি জানায়।<sup>১১</sup> নভেম্বর মাসে 'স্পেশাল পাওয়ার বিল'টি আইনসভায় পাশ করিয়ে জনগণের স্বাধীন কণ্ঠস্বর চাপা দেওয়া হয়। ১৯৪৮-র মাঝামাঝি কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে গত একবছরে শ্রমিকদের মজুরি ৩৩ শতাংশ কাটা হয়েছে এবং বিভিন্ন কারখানা থেকে ১৫০০ শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে।<sup>১২</sup> এআইটিইউসি ও ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের আইএনটিইউসি-র মধ্যে বিভেদ বাড়তে থাকায় একাধিক নতুন সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে।

১৯৪৮-র ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে বি টি রণদিভে কমিউনিস্ট পার্টির নতুন সম্পাদক হওয়ার পর 'ঝুটা স্বাধীনতা'র বাণীতে পার্টির রণনীতি বদলে ফেলা হয়। বর্তমান রাজনৈতিক লাইনে বলা হয় ক্ষমতা দখলের বিপ্লবে শ্রমিকরাই থাকবেন মূল নেতৃত্বে। যার ফলে পার্টি নিষিদ্ধ হলেও শ্রমিক-আন্দোলনের তীব্রতা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। 'শ্রমিক শ্রেণির আক্রমণের কাল' শুরু হয়ে গেছে ধরে নিয়ে শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটের বদলে বিভিন্ন কারখানা দখল করে নেওয়া হয় এবং পুলিশের সঙ্গে লড়াইয়ে অনেক শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে।<sup>১৩</sup> বন্দর শ্রমিকদের আন্দোলন, ছোটো-বড় বিভিন্ন কারখানার ধর্মঘট পর্যাপ্ত নেতৃত্বের অভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। একই পরিণতি ঘটেছিল ১৯৪৯ সালের ৯

মার্চের 'রেল ধর্মঘট'-এর 'হঠকারি' পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও।<sup>১৪</sup> যার ফলে এআইটিইউসি-সহ পার্টির বিভিন্ন ফ্রন্টের সভ্যসংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে।

১৯৪৮ সালে প্রযোজিত মণীন্দ্র মজুমদারের 'মৃত্যু নাই' নাটকটিতে একটি কারখানায় মালিকপক্ষের অন্যায়, শ্রমিকদের উপর পুলিশি অত্যাচার, শ্রমিকদের প্রতিরোধ ও আসন্ন ধর্মঘটের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। ১৯৪৯ সালে প্রযোজিত অরুণ চৌধুরীর 'সব পেয়েছির দেশ' নাটকে একটি মধ্যবিত্ত পরিবার শ্রমিকদের বস্তিবাসী হয় এবং পরে মধ্যবিত্ত সুলভ সংস্কার ঝেড়ে ফেলে শ্রমিকদের সঙ্গে গণসংগ্রামে যুক্ত হয়।

১৯৪৯ সালে প্রযোজিত দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'পূর্ণগ্রাস' নাটকটির কাহিনি কলকাতার উপকণ্ঠে শ্রমজীবী মানুষদের একটি বস্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। বস্তির মালিক জমি দখলের জন্য তার নায়েব-গোমস্তাকে পাঠালে বস্তির মহিলারা রুখে দাঁড়ায়। জমিদার তার অন্দরমহলে পুলিশ-মন্ত্রী-ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে চক্রান্ত করে গায়ের জোরে বস্তি দখল করার পরিকল্পনা সাজায়। পুলিশ এসে বস্তিতে ১৪৪ ধারা জারি করলে বস্তিবাসীরা প্রতিবাদ করে। পুলিশের কাঁদানে বোমের আঘাতে বস্তি কমিটির সদস্য মাধব ও জয়ার সন্তানের মৃত্যু ঘটে। দু-চোখে কান্না নিয়েও তারা প্রতিজ্ঞা করে, "প্রতিশোধ...প্রতিশোধ"।

নাটকটিতে সরাসরি শ্রমিকশ্রেণির জীবনযাত্রা বা শ্রমিক-আন্দোলনের প্রসঙ্গ আসেনি। তবু আমরা নাটকটিকে এই অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করেছি কারণ, নাটকের শুরুতে শ্রমজীবী মানুষদের বস্তিটিকে নিয়ে নাটককার বলেন, "কোলকাতার লোকের মতো এদের আত্মকেন্দ্রিকতা কম; ... জীবন কঠোর বলেই মন এদের সংগ্রামশীল..."<sup>১৫</sup> অর্থাৎ তিনি বুঝিয়ে দিতে চান যে বস্তিবাসী শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে তাদের শ্রেণিচরিত্র অনুযায়ী সহজাত প্রতিবাদী সন্তা বর্তমান। তাই নাটকে বস্তির মহিলাদের প্রতিবাদ বা মাধব-জয়ার সন্তান হারানো প্রতিশোধস্পৃহা তাদের শ্রেণিচরিত্র অনুসারে প্রাপ্ত। ১৯৪৮ সালের ২৯ মে 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকায় 'কাশীপুর বস্তিতে গুণ্ডাদের অত্যাচার' শিরোনামে প্রচারিত সংবাদে নাটকের কাহিনির ন্যায় হুবহু একটি ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। কাশীপুরের শ্রমিক

বস্তির চিন্তামণি দাসের বাড়িতে নড়াইলের জমিদার বীরেন রায়ের নায়েবের নেতৃত্বে পুলিশ ও গুণ্ডারা মিলিত আক্রমণ করে। এই ঘটনাটি ছাড়াও জোর করে শ্রমিক-বস্তি উচ্ছেদের বেশ কয়েকটি ঘটনা তৎকালে ঘটেছিল।

#### গণনাট্য সংঘের নাটকে শ্রমিক শ্রেণির দাঙ্গা-বিরোধী ভূমিকা :

দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে পুঁজিবাদী মালিক শ্রমিক-ঐক্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। ১৯৪৬-র পরে ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলার বাগেরহাটে পুলিশের সঙ্গে সাধারণ জনতার সংঘর্ষের ঘটনাটির সঙ্গে সাম্প্রদায়িক তকমা জড়িয়ে গেলে পুনরায় দাঙ্গা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।<sup>১৬</sup> তার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার শিল্পাঞ্চলগুলিতে উদ্ভূত দাঙ্গার প্রতিচ্ছবি নিয়ে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মশাল' নাটকটি রচনা করেন। ১৯৫৪ সালে গণনাট্য সংঘ দ্বারা প্রযোজিত নাটকটির মূল উদ্দেশ্য দাঙ্গাবিরোধিতা হলেও নাটককার শান্তিরক্ষায় শ্রমিকশ্রেণির ভূমিকা ও দাঙ্গার প্রেক্ষিতে শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্বের অর্থনৈতিক চিত্রটি তুলে ধরেছেন।

নাটকটির 'নিবেদন' অংশে দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান,

"অন্ধকারের মধ্যেও যারা বজ্রকঠিন হয়ে সাম্প্রদায়িক বিরুদ্ধে বলিষ্ঠপদে রুখে দাঁড়িয়েছিল, বিপন্ন মানবতাকে বাঁচাবার জন্যে দৃঢ়সংকল্প হয়ে সংগ্রাম করেছিল, তাদেরই একটি চিত্র মশাল-এ দেবার চেষ্টা করেচি।"<sup>১৭</sup>

নাটকের ঘটনাক্রম কলকাতার একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ও সেই কারখানার শ্রমিকদের বস্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। কারখানার শ্রমিক মতির বোন ললিতা দিনকয়েক আগে পূর্ববঙ্গ থেকে দাঙ্গার কারণে লাঞ্ছিতা ও পুত্রহারা হয়ে ফিরে এসেছে। কলকাতার শ্রমিক অঞ্চলগুলিতেও দাঙ্গার রেশ ছড়িয়ে পড়ছে। মতি, শঙ্কর, শোভনলাল, জালালের মতো বামপন্থী শ্রমিকরা দাঙ্গাবিরোধী কমিটি গঠন ও ইস্তাহার বিলি করেও শ্রমিকদের মন থেকে হিংসার বীজ উপড়ে ফেলতে পারছে না। কারণ

কারখানার মালিকশ্রেণি ও তাদের পোষা দালাল-গুণ্ডারা উভয় ধর্মের মানুষকেই ক্রমাগত দাঙ্গায় প্ররোচিত করছে। যে মুসলমানরা মানুষ খুন করছে, তাদেরকেই মিলের ভিতর আশ্রয় দিয়ে হিন্দু শ্রমিকদের উসকানি দেওয়া হচ্ছে।

দেশভাগের পর অধিকাংশ পাটকল কলকাতায় থাকলেও পাটচাষের মূল কেন্দ্রগুলি পূর্ব-পাকিস্তানে চলে যায়। ফলে কলকাতার দেশি ও বিদেশি পাটকলগুলিকে পাটের জন্য পূর্ব-পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী থাকতে হত। নাটকে ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার ম্যানেজার দাঙ্গা পরিস্থিতিতে হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতা তোষণ করে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের পূর্ব-পাকিস্তানে উদ্বাস্ত করতে চান। নতুন উদ্বাস্ত পরিস্থিতিতে পাকিস্তানকে চাপ দিয়ে আমদানিকৃত পাটের দাম কমানো সহজ হবে। এ-বিষয়ে দেশীয় মালিক-ম্যানেজারদের সঙ্গে বিদেশি কোম্পানিগুলিরও স্বার্থ জড়িত। পাটকলের ব্রিটিশ ম্যানেজার মিঃ জ্যাকসনের মতে দেশীয় মালিকরা সাম্প্রদায়িক উসকানি দিয়ে উদ্বাস্ত প্রবাহ বজায় রাখলে পাকিস্তান সরকার বাধ্য হবে ব্রিটিশ সরকারের কাছে 'নিল ডাউন' করতে। তিনি ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ব্রিটিশ সরকারকে চাপ দিয়ে পাট সরবরাহ সহজ করে নিতে পারবে।

মালিকদের দাঙ্গা পরিস্থিতি জিইয়ে রাখার আরেকটি কারণ শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন করে ছাঁটাই অব্যাহত রাখা। হীরালালের মতো দালাল শ্রমিকদের মাধ্যমে বিষবাষ্প ছড়িয়ে সে চেষ্টায় তারা সফলও হয়। সেই প্ররোচনায় পা দিয়ে আজ শ্রমিকদের শ্রেণিচরিত্রেও আদর্শগত বিভ্রান্তি এসেছে। ধর্মের কারণে জালাল আজ দেশান্তরী হতে চায়, আবার দুর্বলচিত্ত মনোহরকে সাম্প্রদায়িক করে তুলতে মালিকদের অসুবিধা হয় না। মনোহর অনায়াসে বিশ্বাস করে নেয় যে মতির মতো বামপন্থীরা এ-দেশকে পাকিস্তান বানিয়ে ফেলতে চায়। শঙ্কর বা বিহারি শোভনলালের মতো শ্রমিকরা বামপন্থী আন্দোলনের পথে বিশ্বাসী হলেও পরিস্থিতি বিবেচনা করার পক্ষপাতী। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী লালমোহনবাবু মনে করেন মুসলিমদের নিধন না করে তাদের পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। তাহলে এ-দেশে হিন্দুদের কাজের সুযোগ বাড়বে। অর্থাৎ যে লড়াই ছিল শ্রমিকশ্রেণির রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বাধিকার অর্জনের লড়াই তাতে আজ রক্তের ছিটে লেগে গেছে। জালালরা বুঝতে পারে ভাত-কাপড়ের লড়াই আজ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হয়েছে।

শ্রমিকদের এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার দিশা দেখাতে পারত বামপন্থী নেতা মতি। নাটকের প্রথমেই সে মুসলিম দাঙ্গাবাজদের হাতে লাঞ্ছিতা পুত্রহারা ললিতার হাতে জালালের পুত্র জয়নালকে তুলে দিয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতির বিপাকে শ্রমিকদের মধ্যে আদর্শচ্যুতি দেখে সে ক্রমশ হতাশার অন্ধকারে ডুবে গেছে। তার মনে হয় এই সকল বিদ্রান্ত শ্রমিকদের দ্বারা মালিকের বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব নয়। 'আদর্শহীন শিয়াল'-দের নিয়ে কোনো বড়ো লক্ষ্যপূরণ সম্ভব নয়। শঙ্করের মতো বিশ্বস্ত সেনানী তাকে বোঝাতে চেয়েছিল 'শয়তান শয়তান করে সবাইকেই তো শয়তানের দলেই ঠেলে দিচ্ছা' কিন্তু মতির মনে হয় শঙ্কর আজ মুরুব্বি সেজেছে। ললিতা একদিন মতির আদেশে বিনা বাক্যব্যয়ে সন্তান হারানোর যন্ত্রণা ভুলে ভিন্ধের্মের জয়নালকে বুকে তুলে নিয়েছিল। মতি সেদিন ললিতার মানসিক অবস্থা বিচার করে দেখেনি। বর্তমানে ললিতা যখন মাতৃন্নেহ দিয়ে জয়নালকে আগলে রেখেছে, তখন মতি দায়ভার কল্পনা করে ললিতাকে আরেকবার সন্তানহারা করেছে। যেন দুনিয়ার সমস্ত আদর্শ, সমস্ত শুভবুদ্ধির দায় তারই যাড়ে। দাঙ্গাবাজদের হাতে জয়নালের মৃত্যুর পর তার স্বর্গরোজ্যের কল্পনা ধ্বংস হয়ে যায়,

"আঘাত! এ আঘাত তুই বুঝবিনে লীলু—আমার বিশ্বাস, আমার আশা, আমার কল্পনাজগৎ সমস্ত ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে—নেই, নেই একটু আলোও নেই! অন্ধকার, অন্ধকার, কেবল অন্ধকার—"<sup>>৮</sup>

যে আদর্শচ্যুতির দোষে সে অন্যের খুঁত খুঁজে বেরিয়েছে, তার থেকে সে নিজেও মুক্ত নয়। জয়নালের মৃত্যুর দায় তাকে বহন করতে হবে। তার অবিশ্বাস, তার অতি-দায়িত্ববোধ, তার একগুঁয়ে আদর্শবাদী কঠোরতা তাকে সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। রণদিভে পরিকল্পিত লাইনে মতির মতো শ্রমিকের সংখ্যা সেদিন কম ছিল না। নাটককার মতির মাধ্যমে সেদিনের রাজনীতির ত্রুটি তুলে ধরতে চেয়েছেন। লালমোহনবাবু বলেন,

"মতিবাবু, আপনি কেবল পরের ভুলই খুঁজে বেড়াচ্ছেন; নিজের ভুলের দিকে একবারও তাকাতে চান না। সবাইকে ছোটো ভেবে, সবাইকে অবিশ্বাস করে আপনি যদি স্বর্গরাজ্য

সৃষ্টি করতে চান করুন, আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু এদিকে পাটকলের সাহেবরা আমাদের বলবে খুনোখুনি করতে, ওদিকে ভেতরে ভেতরে তাদেরই হুকুমে মিতালির জন্য নয়াদিল্লি আর করাচিতে চলবে হরদম খানাপিনা—এ আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করব না।"<sup>১৯</sup>

শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, দাঙ্গাবিরোধী শ্রমিকরা মতিকে ছাড়াই শান্তি মিছিল বের করে। নাটকের শেষে দাঙ্গাবাজদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে শোভনলালের মৃত্যু তাদের নতুন করে উদ্বুদ্ধ করে। মতি তার সমস্ত গ্লানি মুছে সামনে এসে দাঁড়ায়। শোভনলালের মৃতদেহকে সামনে রেখে তারা প্রতিজ্ঞা করে,

"যারা ঘর পোড়ায়, মায়ের কোল শূন্য করে, মানুষের বুকে ছুরি মারে, গুলি চালায়— স্বার্থের জন্য গরিবের তাজা রক্তে হাত রাঙায়—সেই রক্ত শোষা দুষমনদের বিরুদ্ধে হবে আমাদের শেষ লডাই।"<sup>২০</sup>

#### ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন ও গণনাট্য সংঘের নাটক :

১৯৫১ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু হওয়ার পর ভারতবর্ষের শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি হতে শুরু করে। পাঁচের দশকের শুরুতে গড় মজুরি পঞ্চাশ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিসহ জীবনযাত্রার ব্যয়সূচি বাড়তে থাকায় মজুরি বৃদ্ধি কার্যত অর্থহীন হয়ে পড়ে।<sup>২১</sup> শ্রমিকদের ক্ষোভের আরেকটি কারণ ছিল বিদেশি কোম্পানিগুলির প্রতি সরকারের অত্যধিক পক্ষপাতিত্ব। কিন্তু জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস সরকার বিদেশি কোম্পানিগুলিকে উচ্ছেদ করার কোনো পরিকল্পনা করেনি। এমনকি কোম্পানিগুলি দ্বারা ভারতীয় পুঁজির বহির্গমন রোধ করার কোনো কঠোর ব্যবস্থাও গ্রহণ করেনি। কমিউনিস্ট পার্টির মতে ১৯৫১ থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে চারটি বিদেশি কোম্পানি শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৪৫ কোটি টাকা মূলধন খাটিয়ে ৩৩ কোটি টাকা মুনাফা তুলেছিল। যেখানে বাঙালি মালিকদের আয় ছিল বছরে গড় ৬ কোটি টাকা।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর শেষ লগ্নে এসে পরিকল্পনার বিভিন্ন ব্যর্থতার দিকও প্রকাশিত হতে গুরু করে। সেই সঙ্গে অব্যাহত থাকে ছাঁটাই-এর সমস্যা। ১৯৫১-৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প কারখানার সংখ্যা বাড়লেও ছাঁটাই-এর কারণে শ্রমিক সংখ্যা হ্রাস পায়। ফলে শিল্প ধর্মঘট, সাধারণ ধর্মঘট, মিছিল, সমাবেশের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৫২-তে ধর্মঘটের সংখ্যা ছিল ৯৬৩ ও বিনষ্ট শ্রমদিবসের সংখ্যা তেত্রিশ লক্ষ দিন। কিন্তু ১৯৫৫-তে ধর্মঘটের সংখ্যা হয় ১,৬৬৬ ও বিনষ্ট শ্রমদিবসের সংখ্যা হের পঞ্চান্ন লক্ষ দিন। কিন্তু ১৯৫৫-তে ধর্মঘটের সংখ্যা হয় ১,৬৬৬ ও বিনষ্ট শ্রমদিবসের সংখ্যা হের পঞ্চান্ন লক্ষ দিন।<sup>২৩</sup> অন্যদিকে বেকারত্ব, কর্মীছাঁটাই, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির মতো সমস্যা সাধারণ মধ্যবিত্তের জীবনকে বিপর্যস্ত করে দেয়। বামপন্থী দলগুলির ক্রমাগত প্রচার ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কারণে মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকদের ক্ষোভ একই সরলরেখায় উপস্থিত হয়। আমরা এক্ষেত্রে সামগ্রিক বামপন্থী দলগুলির কথা বলছি কারণ সিপিআই ছাড়াও অন্যান্য দলগুলি শ্রমিক আন্দোলনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আন্দোলনকারীদের মধ্যে সিপিআই সংখ্যালঘু দল ছিল।

১৯৫৩ সালের ২৫ জুন কলকাতার বিদেশি ট্রাম কোম্পানি দ্বিতীয় শ্রেণির ভাড়া ১ পয়সা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। তৎকালে ট্রাম ছিল কলকাতা ও হাওড়ার সাধারণ মানুষের সুলভ যান। বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্যের জ্বালায় জর্জরিত মানুষের অসহিষ্ণু মনে ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির ঘটনা অগ্নিসংযোগ করে। মানুষের ক্ষোভের আরেকটি কারণ ছিল স্বাধীন দেশে বিদেশি কোম্পানি ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে জাতীয় কংগ্রেস সরকারের সম্মতিদান।<sup>২৪</sup> ২৭ জুন রাজ্যের বিভিন্ন বিরোধী পার্টির মিলিত সভাতে ট্রাম ও বাসভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটি (Tram and bus fare enhancement committee) গঠন করা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে জনসাধারণকে আবেদন করা হবে তারা যেন ১ জুলাই থেকে বর্ধিত ট্রামভাড়া দিতে অস্বীকার করেন।<sup>২৫</sup> কলকাতা ট্রাম ওয়ার্কার্স ইউনিয়নও (CTWU) ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিবাদ করে। ৫ জুলাই থেকে শুরু হয় ট্রাম বয়কট আন্দোলন। ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে কংগ্রেসের শ্রমিক ইউনিয়ন বাদ দিয়ে বাকি শ্রমিক সংগঠনগুলি ১৫ জুলাই সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। ১৭ জুলাই কলকাতা ট্রাম ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের (CTWU) পক্ষ থেকে অনির্দিষ্টকালীন কর্মবিরতি ঘোষণা করা হয়।<sup>২৬</sup> বিধানচন্দ্র রায়ের অনুপস্থিতিতে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত
মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন বাধ্য হয়ে ব্যাপারটি ট্রাইবুনালে পাঠান। ২২ তারিখ ময়দানে একটি প্রতিবাদসভা চলাকালীন পুলিশ ও জনতার সংঘর্ষ বাঁধে। যার রেশ চলেছিল ২৯ তারিখ পর্যন্ত। একমাস ব্যাপী আন্দোলনে গ্রেপ্তার করা হয় প্রায় ৪০০০ জনকে, ৬টি ট্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল আড়াই লক্ষ টাকা। পুলিশের গুলিতে অন্তত তিনজনের মৃত্যু ঘটে।<sup>২৭</sup>

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মোকাবিলা' নাটকে মধ্যবিত্তের জীবন-সংগ্রামের সঙ্গে শ্রমিক-আন্দোলনকে যুক্ত করে শ্রেণিসংগ্রামের চিত্র উপস্থিত হয়। নাটকে দেখি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের কর্তা একটি কোম্পানির কেরানি বিশ্বনাথবাবুর বাড়িতে আর্থিক কারণে নিত্য অশান্তি। দারিদ্র্যের সংসারে মেজো ছেলে মনোজিত ট্রাম-কোম্পানিতে ঢুকেছে। মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত সন্তান ট্রাম-শ্রমিকের কর্মজীবন বেছে নেওয়ায় পরিবারের অনেকেরই স্বাভাবিক মূল্যবোধ আহত হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম তার বড়ো ভাই সত্যজিৎ। পুঁথিগত সোশ্যালিস্ট বামপস্থী সত্যজিতের জীবনে একমাত্র স্বপ্ন এ-দেশের বুকে বিপ্লবী সিনেমা তৈরি করা। তার বন্ধু ক্ষয়িন্ধু সামন্ত পরিবারের সন্তান সমরেশের প্রশ্নের জবাবে ভাইয়ের কর্মজীবন সম্বন্ধে সত্যজিতের মন্তব্য 'যাদৃশী ভাবনা যস্য'। পরিবারের বড়ো মেয়ে আরতি মনোজিতের কর্মজীবন সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল। ভাইয়ের প্রেরণাতেই তার মধ্যে বামপন্থী চেতনার উদ্বেষ ঘটেছে। প্রথম দৃশ্যেই আমরা দেখতে পাই ব্যবসায়ী কালীনাথকে। এক সময়ের পারিবারিক বন্ধু কালীনাথ কালোবাজারির টাকায় বর্তমানে বিশ্বনাথবাবুর কোম্পানির মালিন। ঘটনাচক্রে এদের প্রত্যেকেরই শিকড় মধ্যবিত্ত পরিবারে—কিন্তু অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক চেতনার পার্থক্যে পরিবর্তনশীল সমাজের বুকে নাটককার শ্রেণিগত দ্বন্ধকেই নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টির মূল উপাদান করেছেন। স্বভাবিকভাবেই তাঁর সমর্থন সংগ্রামণ্টের বাটে কোর প্রেণিকে।

নাটকে শ্রমিক-জীবনের সার্বিক চিত্র উঠে আসেনি। বরং একটি মধ্যবিত্ত পরিবার কীভাবে তাদের পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণিপরিচয় মুছে শ্রমিক-আন্দোলনের সংগ্রামী চেতনার সঙ্গে একাত্ম হতে পারে তার তাত্ত্বিক দিকটি বড় করে দেখানো হয়েছে। দুই ভাই সত্যজিৎ-মনোজিতের ভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শের দ্বৈরথ বর্তমান সমাজব্যবস্থায় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ধর্মঘট, আন্দোলনের গুরুত্বের প্রয়োজনীয়তার দিকটি আরও বেশি করে তুলে ধরে। তাদের বাবার রাজনৈতিক মূল্যবোধেও আজ

পরিবর্তন এসেছে; যখন তিনি কালীনাথের 'আমার কোম্পানিতে আমি কমুনিস্ট রাখব না' মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন তখন বোঝা যায় বাড়ির পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিবেশের প্রভাব তার উপরেও পড়েছে। নাটকের শেষে ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনে যুক্ত থাকা ফেরার মনোজিতের সন্ধানে বাড়িতে পুলিশ এসে আরতি ও ছোটো ছেলে দীপককে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। সেদিন বিশ্বনাথবাবু পুলিশের চোখে চোখ উচ্চারণ করেন, 'তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।' কান্নায় ভেঙে পড়া স্ত্রী সুভদ্রাকে তিনি জীবনের নতুন মন্ত্র শেখান,

"সারা দেশটাকে এরা শ্মশান করে তুলেচে। তোমার আমার মতো কত লোকের বুক জ্বলছে আজ ঠিক এমনি ধু ধু করে চিতার আগুন।... কিন্তু... কিন্তু এই আগুনে কি শুধু আমরাই জ্বলে-পুড়ে মরব—ওদের কিছুই হবে না? শয়তানের দল শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসবে?... না না, তা হয় না, তা হয় না—ওদের বুকেও জ্বালতে হবে ঠিক এমনি করে আগুন—পুড়িয়ে-গুঁড়িয়ে শেষ করে দিতে হবে।... মরি—মরব—সে অনেক ভালো—কিন্তু এই অত্যাচার... এই অবিচার... আর সহ্য হয় না—অসহ্য! অসহ্য!! অসহ্য!!!"<sup>২৮</sup>

### দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা :

১৯৫৬ সালে চালু হওয়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হয়েছিল ভারি শিল্প ও যানবাহন নির্মাণের উপর। পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ভারত সরকার সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধায় কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী সম্বন্ধে আশাবাদী ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেই আশা ব্যর্থ হয়। ১৯৫৬ সালে শিল্পোৎপাদন ৮.৩ শতাংশ বেড়েছিল, কিন্তু ১৯৫৭ সালে মাত্র ৩.৫ শতাংশ ও ১৯৫৮ সালে ১.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৭-৫৮-তে জাতীয় আয়ের সূচক কমে ১৯৫৩-র সমান হয়ে যায়।<sup>২৯</sup> এর একটি অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে আভ্যন্তরীণ বাজারে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, ছাঁটাই-এর কোপে সাধারণ মানুষের ক্রয়শক্তির সীমাবদ্ধতা। অন্যদিকে আমেরিকা-ইংল্যান্ডের মতো ধনতান্ধ্রিক দেশগুলির সঙ্গে একতরফা বাণিজ্য-নীতির সম্পর্ক এবং সেই কারণে বিদেশে রপ্তানির সংক্রচিত

বাজার ভারতবর্ষের অর্থনীতির অবস্থা বেহাল করে তুলেছিল। দেশীয় ও বিদেশি কোম্পানিগুলির মুনাফা মারফত আদায়ীকৃত পুঁজির বিরাট অঙ্ক বুঝিয়ে দেয় দেশের শ্রমজীবী মানুষের সার্বিক দুবস্থার কথা। ১৯৩৯ সালের মজুরিকে ১০০ ধরলে ১৯৫৬ সালে মজুরির সূচক হয় ১০৫.৪। ১৯৫৭-তে ১০৪.৫ ও ১৯৫৮-তে ১০৩.৯। অথচ ওই একই সূচকমাত্রায় দ্রব্যমূল্য বেড়েছে প্রায় চারগুণ। কিন্তু শিল্পে মুনাফার ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত ছিল। শিল্পে মুনাফার সূচক সংখ্যা ১৯৫৬ সালে ১৬৫, ১৯৫৭ সালে ১৫১.৭, ১৯৫৮-তে ১৬৮.৭। ১৯৫৬-৫৭ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী একজন শ্রমিক ১০০ টাকা মজুরির বিনিময়ে ২৩৯ টাকার পণ্য উৎপাদন করে।<sup>৩০</sup>

১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ত্রিপাক্ষিক শ্রম সম্মেলনে মালিক, সরকার ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দ সম্মেলনে সভাপতির ভূমিকা পালন করেন। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে প্রয়োজনভিত্তিক মজুরি, মহার্ঘভাতা, ন্যূনতম খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান ও শ্রমিক পরিবারের নিরাপত্তার সুপারিশ করা হয়। ড. অ্যাকরয়েড একজন কর্মক্ষম শ্রমিকের জন্য ২৭০০ ক্যালোরি প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিলেন।<sup>৩১</sup> সম্মেলন থেকে কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের মাসিক বেতন ১১০ টাকা থেকে ১৩৭ টাকার মধ্যে করার আবেদন করা হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তর থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে ত্রিপাক্ষিক শ্রম সম্মেলনের সুপারিশের কোনো মান্যতা নেই কারণ সরকার সুপারিশগুলিকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করেনি।<sup>৩২</sup> স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিক শ্রেণির ক্ষোভ ধর্মঘটের রূপ নিয়ে আছড়ে পড়ে। দ্বিতীয় পে-কমিশনের রিপোর্ট সরকারি কর্মচারিসহ সাধারণ চাকুরিজীবীদের হতাশ করেছিল, ফলে শ্রমিক-আন্দোলনে তাদের অকুষ্ঠ সমর্থন ছিল।

১৯৬০ সালের ৮ জুলাই ভারত সরকার ধর্মঘটকে বেআইনি ঘোষণা করে। তার সঙ্গে শুরু হয় ব্যাপক দমননীতি। সারা দেশ জুড়ে ২০০০০ কর্মী গ্রেপ্তার, ১৫০০ কর্মচারীকে বরখাস্ত, ১০০০০ কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত, ১৫০০ কর্মীকে সাজাদান করা হয়। পুলিশের গুলিতে কয়েকজনের মৃত্যু ঘটে।<sup>৩০</sup> ফলে সমগ্র দেশের শ্রমিক-আন্দোলনের অবস্থা অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। কিন্তু পরবর্তীকালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘটনাক্রম শ্রমিক-আন্দোলনের মূল ধারার গতিরুদ্ধ করে দেয়। ১৯৬২ সালে চিন-ভারত যুদ্ধ, ভারতরক্ষা আইন, কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মতবিরোধ এবং ১৯৬৪

সালে পার্টিতে ভাঙনের ফলে শ্রমিক-আন্দোলন দিক্ভ্রষ্ট হয়ে যায়। বিচ্ছিন্ন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনের ধারা অব্যাহত থাকলেও পারিপার্শ্বিক রাজনীতির কারণে ট্রেড-ইউনিয়নের মধ্যেও ঐকমত্যের অভাব দেখা দেয়। ১৯৬৪ সালে ভারত ও পূর্ব-পাকিস্তান দুই দেশেই দাঙ্গা-পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই অস্থির পরিবেশে দাঁড়িয়েও বাংলায় জয়া কারখানার ১৬৩ দিন ব্যাপী আন্দোলন, জেশপ শ্রমিকদের আন্দোলনের প্রস্তুতি, হিন্দ মোটর কারখানার ধর্মঘট, ট্রাম ও কর্পোরেশন শ্রমিকদের আন্দোলনের প্রস্তুতি, হিন্দ মোটর কারখানার ধর্মঘট, ট্রাম ও কর্পোরেশন শ্রমিকদের আন্দোলন সাফল্য লাভ করে। ১৯৬৪ সালের পর থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) পুনরায় শ্রমিক-আন্দোলনের নিজস্ব পথের সন্ধান করতে থাকে। ১৯৭০ সালে সেন্টার অফ ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস্ বা CITU সংগঠিত হওয়ার পর ভারতের শ্রমিক-আন্দোলনের বামপন্থী ধারায় এক নতুন ইতিহাসের সূচনা হয়।

### দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-উত্তর গণনাট্য সংঘের নাটকে শ্রমিক আন্দোলন :

শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দ্বান্দ্বিক' নাটকটি ১৯৫৯ সালে প্রযোজিত হয়। নাটকে দেখা যায় কালীদাসের নেতৃত্বে একটি কারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘট করছে। তাদের দাবি দিন প্রতি মাইনে আট আনা করতে হবে এবং অকারণে ছাঁটাই করা চলবে না। তার সঙ্গে চাই স্বাস্থ্যকর খাদ্য, পরিবারের জন্য বসবাসের উপযোগী বাসস্থান, পর্যাপ্ত চিকিৎসা ও শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা। ১৯৫৭ সালের শ্রম-সম্মেলনেও শ্রমিকরা এই সুপারিশগুলি করেছিল। সদ্য জেল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত পকেটমার বিশু শ্রমিক আন্দোলনের ধারণায় বিশ্বাস করে না। বিশেষ করে যে-আন্দোলনে 'এ-কেলাস' মধ্যবিত্ত শ্রমিক নেতারা যুক্ত থাকে। কারণ এক 'জঙ্গী' শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার সময়ে পুলিশের গুলিতে তার দাদার মৃত্যু ঘটেছিল। মধ্যবিত্ত শ্রমিক-নেতাদের দায়িত্ববোধহীন ও দ্বিধাগ্রস্ত সিদ্ধান্ত এবং ঘনশ্যামের মতো দালাল শ্রমিকদের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হতে হয়েছিল তার দাদাকে। তার মনে হয়,

"ভদ্দরলোকদের দুদিনের শখ; কদিন হৈ-চৈ করবে। তারপর মরতে মরবি তোরা। ওসবে হয় না, কত শালাকে দেখলুম।"<sup>98</sup>

বিশু শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গী কমিউনিস্ট নেতা দিলীপকে একবারের সাক্ষাতেই 'খাঁটি মধ্যবিত্ত শ্রমিক নেতা' বলে চিনে নেয়। দিলীপবাবু আন্দোলনরত অভুক্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের খাদ্যের জন্য তার মৃত বাবার সাধের ঘড়ি বেচে পঞ্চাশ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। অবশ্য আত্মত্যাগের পরেও দিলীপবাবু তার মধ্যবিত্ত 'পেটি-বুর্জোয়া' সুলভ দ্বিধাকে অস্বীকার করেন না। কিন্তু তার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে কালীদাসের মতো শ্রমিকদের সংগ্রামী শ্রেণিচেতনার উপর। তিনি বলেন,

"আমাদের রক্তে আছে বিশ্বাসঘাতকতা। ভয় পেয়ে টাকা খেয়ে আমরা হয়তো পিছিয়ে যেতে পারি কিন্তু কালীদাসের জাত অন্য ধাতুতে গড়া।... আপনার সেই ভাই আবার বেঁচে উঠেছে কালীদাস আর সুরজলালের মধ্যে, হাজার হাজার ইস্পাতে-গড়া খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে।"<sup>৩৫</sup>

দিলীপবাবু 'ইস্পাতে-গড়া' শ্রমিকদের মহান করে তুললেও বাস্তব পরিস্থিতি অন্য কথা বলছে। দিনের পর দিন কারখানা স্ট্রাইক করে তাদের মধ্যে বাসা বেঁধেছে এক রোগ—যার নাম ক্ষুধা। আর ক্ষুধার সবথেকে বড় লক্ষণ আদর্শচ্যুতি আর বেইমানি। পরিবারের ক্ষুধার্ত মুখগুলো ভুলতে চেয়ে সুরজলাল মদ খেয়েছে। আত্মগ্লানিতে সে বলে, "হামাকে বিশওয়াস কোর না কালীভাই। হামারা হিম্মত ভুখ কে পাশ হার গিয়া, অউর হামারা ইমান হার জায়েগা দারুকি পাস।"<sup>৩৬</sup> 'ভুখ'-এর কাছে হেরে মদ্যপ সুরজলাল ধর্মঘট ভেঙে কাজে যোগদান করার কথা ভাবে। আরেক ধর্মঘটী শ্রমিক নেত্যর মনে হয় স্ট্রাইক করে স্ত্রী-পুত্রসহ মরার চেয়ে মালিকের দাবি মেনে নেওয়া ভালো। এই অনাহারের মধ্যেও সুখে আছে দালাল ঘনশ্যাম। সে দিব্যি হোটেল থেকে রুটি-মাংস খেয়ে এসেছে। শ্রমিকদের অবস্থা দেখে ও তার দাদার পরিণতির কথা ভেবে বিশু কালীদাসকে সাবধান করে,

"কালী জেতার লোক আলাদা। জেতার জাত আলাদা—এই সব মাতাল আর দালাল নিয়ে স্টেরাইকে জেতা যায় না।"<sup>৩৭</sup>

বিশুর ধারণা সত্যি হয়। ঘনশ্যাম কালীদাসকে ফাঁসানোর জন্য গোপনে একটি পিন্তল ও চিঠি তার ঘরে রেখে দেয়। কিন্তু পকেটমার বিশ্তর দুনিয়াদারি চোখ থেকে ঘনশ্যামের কার্যকলাপ রেহাই পায়নি। স্ট্রাইক বেআইনি ঘোষিত হতেই কালীদাস, ইসমাইলদের পালিয়ে যেতে হয়। সেই সুযোগে পিন্তল আর সশস্ত্র আন্দোলনের আদেশ দেওয়া চিঠির 'ইনফরমেশন' পেয়ে কালীর ঘর তদন্ত করতে পুলিশ ইঙ্গপেষ্টর উপস্থিত হয়। এগুলি পেলে কালীর দু-বছর বেকসুর জেল হয়ে যাবে। বিশুর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও হাত-সাফাইয়ের খেলায় এ-যাত্রায় বেঁচে গেলেও সে পুনরায় সাবধান করে দিয়ে যায়, "খাঁটি লোক খুঁজে বার কর। আমার দাদার মতো খাঁটি লোক।" আদতে নীতি-বোধের বালাইহীন বলে নিজেকে প্রমাণ করতে চাইলেও বিশু শ্রমিকশ্রেণির সবচেয়ে বড়ো বন্ধুর পরিচয় দিয়ে যায়। পকেটমারের জীবনে ফিরে যাওয়ার আগে সে প্রতিজ্ঞা করে যায়, "আমার ভাই-এর রক্তের দামটুকু যদি শুধে নিতে পার, তাহলে যা বলবে আমি তাই করব।"

সমগ্র নাটকটি বিশুসহ অন্যান্য শ্রমিকের এই দ্বান্দ্বিকতার উপর নির্ভর করে আছে। বিশু আদতে পকেটমার হলেও সে এক বিপ্লবী শ্রমিকনেতার ভাই। মুখে যাই বলুক, তার পক্ষে বেইমানি করা সম্ভব নয়। আজকের দিনে মধ্যবিত্ত দিলীপবাবুও তার 'বিশ্বাসঘাতক' তকমা ত্যাগ করে সংগ্রামী শ্রমিক-আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। সুরজলালকে তার জাতিগত পরিচয়ের জন্য 'খোট্টা', 'ছাতুখোর'-এর মতো প্রাদেশিক কথা শুনতে হয়। ঘনশ্যাম বাঙালি-বিহারির পারস্পরিক জাতিগত দূরত্ব ও অবিশ্বাসকে ব্যবহার করে ঐক্যে ভাঙন ধরানোর জন্য সচেতনভাবে সুরজলালকে ব্যঙ্গ করে। কিন্তু এরা জাতি-ধর্ম-বর্ণের উঠে তাদের শ্রেণিসত্তাকে বড় করে তুলেছে। ইসমাইল, নেত্যরাও ব্যক্তিগত জীবনের বিপর্যয়কে সরিয়ে রেখে পুনরায় কালীর সমর্থনে ফিরে এসেছে। কিন্তু কোন মানসিক বা রাজনৈতিক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বকে জয় করতে পারল তার সন্ধান নাটককার দেননি। ফলে চরিত্রগুলিও শ্রেণি-কাঠামোর যান্ত্রিক অবয়বে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ঘনশ্যামের দালালিকে শান্তি দিয়ে বিশুর শ্রেণিচরিত্রকে জাগিয়ে তোলা ছাড়া নাটকটি আন্দোলনের আর কোনো সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে দেয় না।

মমতাজ আহমেদ খাঁর সম্পাদনা ও নির্দেশনায় 'ইস্পাত' নাটকটি ১৯৫৬ সালে প্রথম প্রযোজিত হয়। মূল কাহিনি রমেন ঘোষ দন্তিদার। 'স্বাধীনতা' পত্রিকার রিপোর্ট তুলে নাটকটির কাহিনি সম্পর্কে সজল রায়চৌধুরী লিখেছেন, ''গৌর নেতা হয়েও দুর্বল। স্ত্রী যক্ষাক্রান্ত। দালালরা গৌরকে করে দুর্বলতর। অন্যান্য মজুররা ভূখা পেটেও লড়াই চালিয়ে যায়। নতি স্বীকার করে না। শেষ পর্যন্ত গৌরের স্ত্রীর বিস্ময়কর দৃঢ়তায় মালিকের চাল ব্যর্থ হয়। গৌর মুক্তি পায় অধঃপতন থেকে। ধর্মঘটে জয় হল শ্রমিকদের।"<sup>৩৮</sup>

হিন্দ মোটরে ধর্মঘটের প্রেক্ষিতে লেখা উৎপল দত্তের 'স্পেশাল ট্রেন' পথনাটকটি ১৯৬২ সালে প্রযোজিত হয়। নাটকে দেখা যায় শ্রমিকরা ন্যায়সংগত বোনাস দাবি করায় উদ্যোগপতি বিডলা কারখানা লক-আউট করে দেয়। ছয় হাজার শ্রমিক তার প্রতিবাদে ধর্মঘট শুরু করায় সরকার ধর্মঘট 'বেআইনি' ঘোষণা করে। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তখন কলকাতায়। শ্রমিকরা পায়ে হেঁটে গিয়ে কলকাতায় প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিয়ে এসেছে। কিন্তু কোম্পানি ও নেহরু সরকার ১০০০ পুলিশের বিরাট বাহিনী লেলিয়ে শ্রমিক-আন্দোলন বন্ধ করার চেষ্টা করেছে। তাতে কাজ না হওয়ায় বাধ্য হয়ে কোম্পানি সরকারের সাহায্যে কলকাতা থেকে 'স্পেশাল ট্রেন'-এ শ্রমিক বোঝাই করে এনে কারখানা চালু করানোর পরিকল্পনা করে। এক পুলিশ-অফিসার ও লেবার অফিসার সেই ট্রেনের জন্য হিন্দ-মোটর স্টেশনে অপেক্ষারত। দুজনের আলোচনায় আন্দোলনের সার্বিক চিত্রসহ তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি উঠে আসে। পুলিশ অফিসার জানায় কীভাবে তারা শ্রমিকদের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, লাঠিচার্জ করে ৯৯ জনের মুখের 'জিওগ্রাফি' বদলে দিয়েছে, এক মহিলাকে শাড়ি খুলিয়ে রাস্তায় দৌড় করিয়েছে, ওই অঞ্চলের সমস্ত সাধারণ মানুষদের জীবন ব্যতিব্যস্ত করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ট্রেনের অপেক্ষায় হিন্দ-মোটর স্টেশনটাও দখল করে নিয়েছে। এমনকি পুলিশ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কারখানা চালু রাখার জন্য ২৫ জন দালাল শ্রমিক জোগাড় করেছে। জনৈক নাগরিক স্টেশনে টিকিট কাটতে এলে তাকেও মারধোর করা হয়। কারণ এটা 'মগের মুলুক নয়, বিড়লাজির মুলুক'।

সেই সময় আগমন ঘটে এক ধর্মঘটরত শ্রমিকের। সে পুলিশ ও লেবার অফিসারের চোখে চোখ রেখে বলে,

"অর্থনীতির মূলস্তম্ভ আমরা মজুররা গড়েছি, আমরাই গড়তে থাকব। অর্থনীতির সবচেয়ে বড় শত্রু, সবচেয়ে বড় দেশদ্রোহী হল ওই বিড়লা।"<sup>৩৯</sup>

গত বারো বছর ধরে লেদ চালানোর পরেও আজ তার মাসিক মাইনে ৭৬ টাকা। কোনো পে-ক্ষেল নেই, উন্নতি নেই, কর্ম-নিরাপত্তা নেই, স্বাস্থ্যকর খাদ্য-বাসস্থানের বালাই নেই। অথচ বিড়লা সাহেব এই বছরে কারখানা থেকে প্রায় তিন কোটি টাকা মুনাফা তুলেছে। সে তথ্য-পরিসংখ্যান উল্লেখ করে জানায় সাধারণ মানুষ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও শিল্পপতিদের থেকে তিনশো কোটি টাকা বেশি কর দিয়েছে। শ্রমিকদের বেতন-বোনাস না দিয়ে, ছাঁটাই করে বিরাট অঙ্কের উদ্বৃত্ত মূল্য বিড়লার মতো কোম্পানি ঘরে তুললেও সরকার নীরব। সে অভিযোগ করে 'দালাল' কংগ্রেস সরকার শিল্পপতিদের অনাদায়ী কর আদায় করেনি বা বিদেশের ব্যাঙ্কে সঞ্চিত তাদের 'কালো ধন' আদায়ের কোনো চেষ্টা করেনি। অথচ এর প্রতিবাদ করলেই শ্রমিকরা হয়ে যায় 'চিনের দালাল', 'রাশিয়ার দালাল'। শ্রমিকদের শায়েন্তা করতে সরকার হাজার পুলিশ পাঠাতে পারে, কিন্তু অকর্মণ্য সরকার দেশের সীমান্ত রক্ষা করতে পারে না। এদিকে 'স্পেশাল ট্রেন' এসে পড়ল বলে। কিন্তু সেই ট্রেন হিন্দ মোটরে দাঁড়ায় না। হাওড়ার মজদুররা খবর রটিয়ে দেওয়ায় উত্তরপাড়া স্টেশনে হাজার হাজার মানুষ ট্রেন থামিয়ে 'দালাল' শ্রমিকদের ট্রেন থেকে নামিয়ে দের। খবর পেয়ে শ্রমিকটি ঘোষণা করে.

"সাধের স্পেশাল ট্রেন কোথায় গেল? মজদুর-মধ্যবিত্তের ঐক্যের সামনে বিড়লা আর তার সরকারি চাকররা এইবার কী করবেন? হিন্দ-মোটরের হরতাল ভাঙবেন না? আসুন! বিড়লারা আসুন! কংগ্রেসি পুলিশ আসুন হাজারে হাজারে। ফৌজ আনুন! তবু এ হরতাল চলবে! মুখোশ খুলে কংগ্রেস তার নগ্ন বীভৎস চেহারা দেখিয়েছে! সেই কংগ্রেসকে আর তার প্রভু বিড়লার দলকে টান মেরে ধুলোয় ফেলে দেওয়ার দিন আসছে! দেরি নেই, আর দেরি নেই।"<sup>80</sup>

'স্পেশাল ট্রেন' নাটকটি অ্যাজিট-প্রপ ধরনের পোস্টার নাটক। নাটককার সচেতনভাবেই নাটকটিতে নাট্যদ্বন্দ্ব বা চরিত্রচিত্রণের প্রচেষ্টা করেননি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মালিক-শ্রেণি, সরকার ও

পুলিশের মুখোশ উন্মোচন। নামহীন শ্রমিক চরিত্রটির সংলাপে তথ্য-পরিসংখ্যানের বাহুল্য নাটকটিকে ভারাক্রান্ত করে তুললেও আদতে নাটককারের উদ্দেশ্যপূরণে সহায়ক হয়। জ্যোতি বসু, রণেন সেন, মনোরঞ্জন হাজরার মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বান্তব কার্যকলাপের প্রসঙ্গ এনে নাটকের সমসাময়িক পরিস্থিতিকে আরও জীবন্ত করে তোলার চেষ্টা করেছেন। শ্রেণিচরিত্রের পার্থক্য দেখানোর জন্যই দালাল শ্রমিকটি কান্নাকাটি করে আর মধ্যবিত্ত কেরানি নাগরিক মার খেয়ে ভয়ে পালিয়ে আসে। উৎপল দত্তের স্বভাবসিদ্ধ সাবলীল লেখনী এবং পোস্টার নাটকের একরৈখিক গতি ও জোরালো সংলাপের কারণে নাটকটি তৎকালে জনপ্রিয় হয়েছিল।

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আজকের উত্তর' নাটকটিতেও শ্রমিক-আন্দোলনের প্রসঙ্গ এসেছে। নাটকে পুরাণের দার্শনিক চরিত্ররা বর্তমান সমাজে এসে পৌঁছোয়। কারখানার মালিকের সঙ্গে সংগ্রামরত ফণীর বাস্তব জীবনবোধের কাছে চার্বাকের দর্শনতত্ত্ব, দধীচির আত্মত্যাগের মহিমা ফিকে মনে হয়। আরেক পৌরাণিক চরিত্র ব্রহ্মজ্ঞানের সন্ধানরত নচিকেতা আবিষ্কার করে মালিক ঝুনঝুনদাসই আসলে মৃত্যুর দেবতা যমরাজ। পৌরাণিক চরিত্ররা অনুধাবন করে শ্রমিকের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে নতুন সত্যযুগ আসতে চলেছে। আদতে এ-সব ঘটনা ঘটছিল ফণীর স্বপ্নে। ঘুম থেকে উঠে সে জানতে পারে শ্রমিকদের সংগ্রামে ঝুনঝুনদাস হার মেনে নিয়েছে। নাটককার আজকের উত্তরের সন্ধান করলেও প্রশ্নচিহ্নটি তৈরি করতে পারেননি। 'উত্তর'-এ এসে পৌঁছোনোর ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার সংঘাত ও দ্বন্দ্বের অভাবে নাটকটি এক অদ্ভুত-অলীক সমাধানে এসে উপস্থিত হয়।

এই পর্বে শ্রমিকশ্রেণি ও শ্রমিক আন্দোলন কেন্দ্রিক যে নাটকগুলি আমরা আলোচনা করেছি তাতে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোনো নাটকেই বাস্তবের শ্রমিকদের চিত্র ও তাদের প্রত্যক্ষ শ্রমিক আন্দোলনের চিত্র উপস্থাপিত হয়নি। প্রায় প্রত্যেকটি নাটকই শ্রমিকদের শ্রেণিচেতনার তাত্ত্বিক বোধের উপর ভিত্তি করে রচিত। মধ্যবিত্ত জনতার জাগরণ ও শ্রেণিসংগ্রামের ধারণায় বিশ্বাসী করে তোলার প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়। নাটকগুলি মূলত শ্রমিকশ্রেণিকে জড়তা ঝেড়ে ফেলে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রচিত ও প্রযোজিত। তৎকালীন ইতিহাসে গণনাট্য সংঘের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করলে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছিল বলেই অনুমান করা যায়।

তথ্যসূত্র :

- ১। সুকোমল সেন; ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ষষ্ঠ সংস্করণ ২০১৫, পৃ-২২
- Narx to Friedrich Bolte In New York, Marx Engels Selected Works Volume
  2, progress publishers, 1973, p- 423-424
- ৩। ত. ভলকভ ও ফ. ভলকভ; উদ্বৃত্ত মূল্য কী (অনুবাদ- প্রফুল্ল রায়), প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, পৃ-৩২৩
- ৪। প্রাণ্ডক্ত, ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, পৃ- ১১
- ৫। তদেব, পৃ- ৩৬৫
- ৬। সুমিত সরকার; আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, পৃ-৩৪০
- ৭। তদেব, পৃ- ৩৪২
- ৮। অনিল বিশ্বাস (সম্পাদনা); বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯, পৃ- ৮৭
- ৯। প্রাণ্ডক্ত, ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, পৃ- ৩৭৭
- ১০। দিলীপ গুহ; স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবাংলায় গণআন্দোলন (১৯৪৭-৬২), তিন দশকের গণআন্দোলন, (সম্পাদনা- অনিল আচার্য), অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২০১৮, পৃ- ৭৯।
- ১১। অমলেন্দু সেনগুপ্ত; উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব, প্রতিভাস, ২০০৬, পৃ- ২০৫
- ১২। অনিল বিশ্বাস (সম্পাদনা); পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস শাসনের এক বছর, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, দ্বিতীয় খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯, পৃ- ৫১
- ১৩। প্রাগুক্ত, সংকীর্ণতাবাদী হঠকারি লাইনের বিরুদ্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির আত্মসমালোচনা— ১৯৫০, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ- ১৮৮

২৮৩

২৮। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; মোকাবিলা, পুস্তকালয়, ১৯৫০, পৃ- ৮৯

(১৯৫৩) ও শিক্ষক আন্দোলন (১৯৫৪), তিন দশকের গণআন্দোলন, পৃ- ২০৭

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, সপ্তম খণ্ড, মনীষা, মে ২০১১, পৃ- ৩১৮ ২৭। প্রাগুক্ত, ১৯৫০-এর দশকে কলকাতায় গণআন্দোলনের দুটি মুহূর্ত : ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলন

আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ- ৪৭৭ ২৬। মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত (সম্পাদনা); নির্বাচন পরবর্তীকালে পার্টির সামনে কর্তব্য,

২৪। প্রাণ্ডক্ত, অম্বেষা সেনগুপ্ত; ১৯৫০-এর দশকে কলকাতায় গণআন্দোলনের দুটি মুহূর্ত : ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলন (১৯৫৩) ও শিক্ষক আন্দোলন (১৯৫৪), তিন দশকের গণআন্দোলন, পৃ- ২০৫ ২৫। প্রাগুক্ত, কলকাতায় ট্রামভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম একটি পর্যালোচনা, বাংলার কমিউনিস্ট

২০০৮, পৃ- ৩১২-৩১৩

২১। প্রাগুক্ত, ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, পৃ- ৪০১ ২২। অনিল বিশ্বাস (সম্পাদনা); আগামী নির্বাচনে গণতান্ত্রিক ঐক্যের কর্মসূচি, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, তৃতীয় খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড,

২০। তদেব, পৃ- ৮৭-৮৮

১৯। তদেব, পৃ- ৮২

১৮। তদেব, পৃ- ৭৫

১৭। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; মশাল, পুস্তকালয়, ১৯৫৪, নিবেদন অংশ

১৬। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়; দেশভাগ-দেশত্যাগ, অনুষ্টুপ, ২০২০, পৃ- ৮১

১৫। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; পূর্ণগ্রাস, পুস্তকালয়, ১৯৪৮, পৃ- ৩

২৩। প্রাগুক্ত, ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, পৃ- ৪০২

পূ- ৯২

১৪। প্রাগুক্ত, স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবাংলায় গণআন্দোলন (১৯৪৭-৬২), তিন দশকের গণআন্দোলন,

- ২৯। মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত (সম্পাদনা); সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটির প্রস্তাব, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, দ্বাদশ খণ্ড, মনীষা, জানুয়ারি ২০১৪, পু- ৫৮-৫৯
- ৩০। প্রাগুক্ত, জাতীয় পরিকল্পনা কোন পথে?, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ- ৬০-৬১
- •> Report of the Expert Committee on Determining the Methodology for Fixing the National Minimum Wage, Ministry of Labour and Employment Government of India, January 2019, p- 13

৩২। প্রাণ্ডক্ত, ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, পৃ- ৪০৪

৩৩। তদেব, পৃ- ৪০৫-৪০৬

৩৪। অমর গঙ্গোপাধ্যায়; দ্বান্দ্বিক, বাংলা একাঙ্ক নাট্য সংগ্রহ, সাহিত্য আকাদেমি, ১৯৬০, পৃ- ৩৪৯

৩৫। তদেব, পৃ- ৩৫৩

৩৬। তদেব, পৃ- ৩৫০

৩৭। তদেব, পৃ- ৩৬১

৩৮। সজল রায়চৌধুরী; গণনাট্য কথা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ- ১৭০ ৩৯। উৎপল দত্ত; স্পেশাল ট্রেন, নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪২৩

বঙ্গাব্দ, পৃ- ৫২৭

৪০। তদেব, পৃ- ৫২৯

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# মধ্যবিত্ত শ্রেণি, মধ্যবিত্ত জীবনযন্ত্রণা এবং গণনাট্য সংঘের নাটক

## মধ্যবিত্ত বাঙালির স্বরূপ :

আধুনিক সময়ে বাঙালির চিন্তা-চেতনার বিকাশ, শিক্ষা-বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা, সমাজ বিবর্তনের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আন্দোলনের মূল ধারক ও বাহক হল মধ্যবিত্ত শ্রেণি। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সমন্ত গৌরব সঙ্গে নিয়ে আধুনিক মধ্যবিত্ত বাঙালির শ্রেণিরূপে উদ্বেষ ঘটে। একদিকে প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিকতা ও উপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা থেকে আহরিত সংকীর্ণ স্বার্থপরতা, অন্যদিকে উন্মুক্ত বিশ্ব-চেতনার মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়ার সাহসী উদারতার অদ্ভুত সংমিশ্রণ মধ্যবিত্তের চারিত্রিক বৈশ্ব-চেতনার মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়ার সাহসী উদারতার অদ্ভুত সংমিশ্রণ মধ্যবিত্তের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে বহুমুখীনতা দান করেছে। ফলে তার মধ্যে যেমন ইতিহাসের ধারার সঙ্গে পরিবর্তিত হওয়ার সাবলীল দক্ষতা রয়েছে, তেমনিই মধ্যযুগীয় স্থিতিশীলতা বার বার তাকে পিছু টেনে ধরেছে। আবার মধ্যবিত্ত বাঙালির মধ্যেই দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠে সামাজিক ও রাজনৈতিক শিক্ষার দ্বারা আত্মসচেতন হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তাঁরাই শিক্ষার আলো বৃহত্তর জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে আগত ভবিষ্যতের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। একক থেকে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে ওঠা মধ্যবিত্ত জনচেতনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তনের যোগফল একদিন সমাজের বৃহৎ রদবদলের মূল উপাদান হয়ে ওঠে।

ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের প্রবল আঘাতে মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা ভেঙে শুধুমাত্র পণ্য-উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যবর্তী শ্রেণি রূপে 'পেটি-বুর্জোয়া' শ্রেণির জন্ম হয়েছিল। বাংলায় মধ্যবিত্তের উৎপত্তি এ-পথে হয়নি। মুসলিম শাসকের পতনের পর ইংরেজ প্রবর্তিত আধা-পুঁজিবাদী ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক

শাসনব্যবস্থা হিন্দু বাঙালি মধ্যবিত্তের জন্ম দিয়েছিল। গ্রামে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 'মধ্যস্বত্বাধিকারী' ও শহরে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের অর্থানুকুল্যে প্রতিপালিত দেশীয় বুর্জোয়াদের দৌলতে হিন্দু বাঙালি মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয়েছিল। ফলে কার্ল মার্কসের পুঁজিপতি ও প্রলেতারিয়েত শ্রেণির মধ্যবর্তী স্তরে 'পেটি-বুর্জোয়া' শ্রেণির সঙ্গে বাংলার মধ্যবিত্তের পার্থক্য রয়েছে। গ্রাম-শহরের মধ্যে দূরত্বগত দ্বন্দ্ব যেমন ছিল, তেমনই মেকলে মিনিটস বা উডের ডেসপ্যাচের কারণে বহুমুখী মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম হয়েছিল। শিক্ষাব্যবস্থা শহর নির্ভর হওয়ায় বুদ্ধির চর্চা ও চেতনার বিকাশের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হয়েছিল। সীমাবদ্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়েও একদল মহান বাঙালি আমাদের জগদ্দল সমাজব্যবস্থাকে ক্রমাগত ধাক্কা দিয়ে সচল করেছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রাপ্তমনক্ষ হয়ে ওঠার কাল। এই সময়ে তাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যার বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। যার মধ্যে প্রধানতম ছিল পরাধীনতা। উনিশ শতকের শেষ থেকে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উত্থান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির মনে নতুন আশা সঞ্চার করেছিল। কিন্তু কংগ্রেসি নেতৃত্বের ক্রমাগত আপস ও দ্বিচারিতা স্বাধীনতার পথ সম্পর্কে বাঙালিকে হীনমন্য করে তোলে। মাত্র দেড় দশকের মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকরতা ও আর্থিক মহামন্দার প্রকোপ মধ্যবিত্ত বাঙালির চিরাচরিত সামাজিক মূল্যবোধকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। পৃথিবীর পুঁজিবাদী দেশগুলির যুদ্ধ-পিপাসার নিরন্তর দ্বন্দ্ব বাঙালি জাতি ক্রমশ অভাব-অনটন-দারিদ্র্যের মধ্যে ডুবে গেছিল। এককালে বাঙালি মধ্যবিত্তের কাছে ইংরেজ জাতি ছিল মুক্তিসূর্যের বাহক, আজ সেই সূর্যের প্রবল তাপে সমস্ত খোলস খুলে ইংরেজের প্রকৃত চরিত্র নগ্নভাবে ধরা দেয়। একই সময়ে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের সাম্যবাদী-সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত বাঙালিকে নতুন আলোর সন্ধান দেয়। চারের দশকে ইউরোপে ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির সৃশংসতার বিরুদ্ধে বামপন্থী রাজনীতির আবির্ভাবে ঘটেছিল যেন এক বিশ্বব্যাপী মুক্তিদাতা রূপে।

১৯৪৩ সালে নবজাগ্রত সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার বাণী জনমানসে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে গণনাট্য সংঘের আবির্ভাব ঘটেছিল। বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ ছিল গণনাট্য সংঘের

আন্দোলনের প্রধান হোতা। সেদিনের উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মার্কসবাদের চেতনা মধ্যবিত্ত শাসিত বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনকে নতুন দিশার সন্ধান দিয়েছিল। গণনাট্য সংঘের দায়িত্ব ছিল কৃষক-শ্রমিক তথা সর্বহারা জনগণকে শ্রেণিসচেতন রাজনীতির আঙিনায় টেনে এনে সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক রূপরেখাকে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠা দান করা। অবধারিতভাবে নির্মাণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনমত গঠনে সবথেকে বড় ভূমিকা ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের। কিন্তু তাত্ত্বিক বামপন্থী রাজনীতিতে 'পেটি-বুর্জোয়া' শ্রেণির বৃহত্তর সংখ্যক মানুষ তাদের স্বাভাবিক জড়তা অতিক্রম করে কখনই স্বেচ্ছায় সমাজবিপ্লবে অংশ গ্রহণ করে না। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এদের প্রতিনিধিত্ব বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যবর্তী স্থানে হলেও মধ্যবিত্ত সুলভ স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিচিন্তার দাসত্বের জন্য এরা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। অথচ কায়িক বা মানসিক শ্রমের সাহায্যে সঞ্চয়িত ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পদের উপর ভিত্তি করে মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রতিষ্ঠিত। ফলে শ্রমনির্ভরতার দিক থেকে তারা আদতে প্রলেতারিয়েতের সম্ভাব্য বন্ধু 🖓 তাছাড়া পুঁজিবাদী সভ্যতার ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের সমাজে প্রত্যেকটি মানবিক সম্পর্ককেও পণ্য করা তোলা হয়। শিল্প-সাহিত্যের মৃল্যও বিচার করা হয় পণ্য-উৎপাদনের তুলাদণ্ডে। বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থায় মধ্যবিত্তের মধ্যে শ্রেণিসচেতন রাজনীতির বোধ প্রস্তুত হয় না। ফলে পুঁজিবাদী সভ্যতার প্রকৃত স্বরূপ তার কাছে ধরা পড়ে না। কিংবা ধরা পড়লেও পুঁজিবাদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রলোভনে জড়িয়ে বৃহত্তর শ্রেণিস্বার্থকে সে উপেক্ষা করে। গণনাট্য সংঘের কর্তব্য ছিল রাজনৈতিক তত্ত্ব ও তৎকালীন ঘটনার সার্থক মিশেল ঘটিয়ে মধ্যবিত্তের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরে তাকে শ্রেণিসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা।

### স্বাধীনতা-পূর্ব বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবন ও গণনাট্য সংঘের নাটক :

বিংশ শতাব্দীর তিনের দশক বহন করেছিল ঝড়ের পূর্বাভাস; চারের দশকের সূত্রপাত হল অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে প্রবল ঘূর্ণাবর্তের সঙ্গে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ—সব মিলিয়ে বাংলার অবস্থা দুর্বিষহ হয়ে উঠল। সেই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি 'জনযুদ্ধ নীতি'-র কারণে

ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে 'জাতীয় সংকট' রূপে অভিহিত করেছিল। আন্দোলনকারী স্বতঃস্ফূর্ত জনতাকে 'পঞ্চম-বাহিনী' চিহ্নিত করায় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা সাধারণ মধ্যবিত্তের বিরাগভাজন হয়েছিল।<sup>২</sup> 'জনযুদ্ধ নীতি'-র সময়ে পার্টির জনবিচ্ছিন্নতা 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'-এ নিঃস্বার্থভাবে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত মানুষের সাহায্যের ফলে দূর হয়।

দুর্ভিক্ষের সেই মর্মান্তিক দিনগুলিতেও এক শ্রেণির বাঙালির দায়িত্বজ্ঞানহীন অমানবিক আচরণ আমাদের ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষিজীবী মানুষেরা শহরে এসেছিল ভদ্রলোক 'বাবু'দের অনুদানের ভরসায়। কিন্তু দেখা গেল শহুরে স্বার্থপর ভদ্রলোকেরা অনাহারের হাহাকারের মধ্যেও বিলাস-ব্যসনের মধ্যে উদাসীন জীবনধারণ করছে। আইনের ফাঁক গলে, মানবিকতাকে পদপিষ্ট করে উপচে পড়া বৈভবের জৌলুস একশ্রেণির উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্তের মানুষের হাত রক্তাক্ত করেছিল বললে অত্যুক্তি করা হয় না।

গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকে মধ্যবিত্ত সমাজের অমানবিক অন্ধকার দিকের অবিকল বর্ণনা উঠে এসেছে। 'নবান্ন' নাটকে একদিকে যেমন দুর্ভিক্ষগ্রস্ত বাংলার পীড়াদায়ক সত্যের জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি রয়েছে, অন্যদিকে একশ্রেণির শহুরে বাবুদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার চিত্র অঙ্কণ করে তাদের প্রকৃত ঘৃণ্য চেহারাটি উন্মোচন করা হয়েছে। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে আমরা দেখি শহরের এক ধনী ব্যক্তির আলোকসজ্জিত বাড়িতে বিরাট ভূরিভোজের আয়োজন করা হয়েছে। একাধিক গণ্যমান্য অতিথিদের আলোচনা গুনলে মনে হয় না কুঞ্জ-রাধিকার মতো লক্ষ লক্ষ দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ সম্পর্কে তাদের ন্যূনতম সচেতনতা রয়েছে। মানুষ যখন খেতে পাচ্ছে না কিংবা ডাস্টবিন থেকে খাবার কুড়িয়ে খাচ্ছে, তখন ভারতরক্ষা আইনের ফাঁক গলে তাদের অনুষ্ঠানে হাজার-হাজার অতিথির খাবার নষ্ট হচ্ছে।

"২য় ভদ্রলোক: হ্যাঁ, তারপর কতজনকে নেমন্তন্ন করলে?

বড়োকর্তা: তা-ভাই, হাজার খানেক হবে। ছেঁটে কেটে ওর চেয়ে আর কমতি করা গেল না।

৩য় ভদ্রলোক: পুরোপুরি এক হাজার? বল কী হে, পঞ্চাশ জনের জায়গায় এক হাজার! ভারতরক্ষা-বিধানে লটকে যাবে যে বাবা।

বড়োকর্তা: হ্যাঃ, ও বিধান আছে, আইন আছে, আবার আইনের ফাঁকও আছে..."

পঞ্চাশের মম্বন্তরের প্রধান কারণ ছিল কালোবাজারি। যার ফলে খাদ্যদ্রব্য দরিদ্র-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের অর্থসীমার নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল। অথচ এই সকল উচ্চবিত্ত মানুষদের কালোবাজারির উপর নির্ভরতা ও গুণকীর্তন কালোবাজারিকে পরোক্ষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। নাটকে দ্বিতীয় ভদ্রলোক বলেন,

"তা ও বেঁচে থাক বাবা ব্ল্যাক মার্কেট, বেঁচে থাক আমার মজুতদার, না হয় চতুর্গুণই পয়সা নেবে, জিনিসটি তো ঠিক ঠিক পাওয়া যাবে। করব কী বল? পয়সা তো আর সঙ্গে যাবে না।"<sup>8</sup>

এই ধনী বাড়ির আলোর রোশনাইয়ের পিছনে থাকা অন্ধকারে বসে কুকুরের সঙ্গে মারামারি করে ডাস্টবিন থেকে উচ্ছিষ্ট খুঁটে খায় কুঞ্জ, রাধিকা, প্রধান। বিজন ভট্টাচার্য দুটি ঘটনাকে পাশাপাশি রেখে দুর্ভিক্ষের সমকালের সমাজব্যবস্থার একটি 'কনট্রাস্ট' তৈরি করেন।

শুধু বিয়েবাড়ির দৃশ্যে নয়; কঙ্কালসার নারীদেহের মধ্যে ফটোগ্রাফারদের 'বাংলার ম্যাডোনা'র সন্ধান কিংবা বিনোদিনীর ভদ্রবেশী নারীশিকারীর ফাঁদে পড়া প্রভৃতি দৃশ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণিসহ সমগ্র কলকাতাকেই কলঙ্কিত করে তোলা হয়েছে। কিন্তু এটাই তো সেদিনের কলকাতার সম্পূর্ণ চিত্র নয়। কলকাতার মধ্যবিত্ত মানে শুধু টাউট, চোরাকারবারি, বিলাসজীবী ভদ্রলোক নয়। দুর্ভিক্ষের দিনে সংগঠিত ও অসংগঠিতভাবে বহু মানুষ ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ করে মানুষকে সেবা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ফটোগ্রাফাররা তাদের ক্যামেরায় এবং চিত্রশিল্পীরা তাদের রঙ-তুলিতে মম্বন্তরের জীবন্ত চিত্র ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত করে রেখেছিলেন। ঘটনাচক্রে কমিউনিস্ট পার্টি ও গণনাট্য সংঘের কলকাতা-কেন্দ্রিক সদস্যরাও মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকেই উঠে আসা। গণনাট্য সংঘের জন্মই হয়েছিল পিপলস রিলিফ কমিটির জন্য সারা ভারতবর্ষ ঘুরে অর্থসংগ্রহের জন্য। নাটককার স্বয়ং সংঘের সদস্য

হয়েও দুর্ভিক্ষের দিনে তাদের ভূমিকার কথা কীভাবে ভুলে যেতে পারেন? দর্শন চৌধুরী নাটকটির এই বিশেষ দুর্বলতাটি উল্লেখ করে আরেকটি বড় সামাজিক ব্যর্থতার দিকে ইঙ্গিত করেন।

"দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষেরা কলকাতা শহরে শুধু হৃদয়হীন, চক্রান্তকারী এবং উদাসীন মানুষের দেখা পেল—আরেকটা বড়ো দুনিয়ার কোনো সংবাদ তারা পেল না।"<sup>৫</sup>

বিজন ভট্টাচার্যের মতো নাটককারের এরকম একদেশদর্শিতার কারণ কী? দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আলোচনায় জানিয়েছেন, "জীবনবোধে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টির অভাবেই এটা মনে হয়।"<sup>৬</sup> আমাদের মনে হয় বিজন ভট্টাচার্য তথা গণনাট্য সংঘের তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে 'পেটি-বুর্জোয়া' শ্রেণি সম্পর্কে তখনও সম্যক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠেনি। অর্থাৎ আত্মকেন্দ্রিক 'পেটি-বুর্জোয়া' শ্রেণি কীভাবে সমাজবদলে ভূমিকা রাখতে পারে এবং কীভাবে তাকে প্রতিবাদী করে শ্রেণিসংগ্রামে টেনে আনা যায় তার চেতনা তখনও প্রস্তুত হয়নি। 'নবান্ন' নাটকে যার আদর্শ উদাহরণ নির্মলবাবু ও চাল কিনতে আসা ভদ্রলোক। নির্মলবাবু দুর্ভিক্ষের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়েও নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করেননি। তিনি অভুক্ত মানুষদের প্রতি সহানুভূতিশীল, কিন্তু বড়লোকি অপব্যয়ের দৃঢ় প্রতিবাদ না করে শেষ পর্যন্ত চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়-র সারিতে গিয়ে দাঁড়ান। স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে গণনাট্য সংঘ ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থায় 'পেটি-বুর্জোয়া' ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে।

### স্বাধীনতা ও মধ্যবিত্তের মোহভঙ্গ :

১৯৪৭ সালে দাঙ্গা ও দেশভাগের মধ্যে দিয়ে এল আমাদের স্বাধীনতা। বাঙালি মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ স্বাধীনতার ইতিবাচক দিকগুলি নিয়ে অত্যন্ত আশাবাদী ছিল। কারণ, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন স্বাধীনতার আন্দোলনকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাই ধারাবাহিক অগ্রগতি দিয়ে এসেছিল। বাংলার বিপ্লবী মধ্যবিত্ত জনতার দেশের স্বাধীনতায় তাদের ভূমিকা নিয়ে একধরনের উন্নাসিকতাও ছিল। অন্যদিকে স্বাধীনতার কালে বাংলার কৃষক সমাজ তেভাগা আন্দোলনে ফসলের প্রাপ্য অধিকার আদায়ের জন্য লড়ছিল। লক-আউট, ছাঁটাইয়ের কোপে শ্রমিকশ্রেণি ধুঁকে ধুঁকে মরছিল। উদ্বাস্ত মানুষের ঢল এসে

জমা হচ্ছিল শিয়ালদহ স্টেশনে। অবশ্য ১৫ আগস্টের পরদিনই এক তুড়িতে সব বদলে যাবে এমন আশা কেউই করেনি। স্বাধীনতাকে সামনে রেখে দেশ-গঠনের সদর্থক পরিকল্পনার জন্য বাধ্যত কষ্ট স্বীকার করতে মধ্যবিত্তের আপত্তি ছিল না। কিন্তু কংগ্রেস সরকারের নীতি যে ইংরেজ রাজশক্তিরই দুর্বল সংস্করণ হয়ে উঠতে পারে সেই দুরাশা কেউ করেনি।

১৯৪৭ সালের ২১ নভেম্বর প্রফুল্ল ঘোষ সরকার শহর ও মফস্বল অঞ্চলগুলিতে ক্রমবর্ধমান আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য 'পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ ক্ষমতা আইন' জারি করে। এই বিলের বিরোধিতায় স্বাধীন ভারতবর্ষ জন্মের ১১৭ দিনের মাথায় পুলিশের গুলিতে রেডক্রস কর্মী শিশির মণ্ডল মারা যান।<sup>৭</sup> ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৪৯ সালে রাজবন্দিদের ন্যায্য দাবির আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিলেন লতিকা-প্রতিভা-অমিয়া-গীতার মতো কমিউনিস্ট নেত্রীরা।<sup>৮</sup> এই সকল নারী বা শিশির মণ্ডল, এরা কেউ শ্রমিক-কৃষকের পরিবার থেকে উঠে আসেনি। এদের উত্থান মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকেই। হয়তো সেই কারণেই লতিকা-প্রতিভা-অমিয়া-গীতার হত্যাকাণ্ডকে আনন্দবাজার পত্রিকা 'শোচনীয়' বলে অভিহিত করেছিল। অহল্যা-উত্তমী-বাতাসীদের জন্য সেই শব্দটুকুও বরাদ্দ হয়নি।<sup>৯</sup>

১৯৫০ সালে কমিনফর্মের দলিল প্রকাশের পর কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে রণদিভের 'ঝুটা স্বাধীনতা'-র বিরুদ্ধে আত্মসমালোচনা শুরু হয়। কমিনফর্মের দলিলে ভারতবর্ষের পার্টিকে 'চিনের পথ' নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।<sup>১০</sup> অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণি, পার্টি, গ্রুপ ও সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয় সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা। চিনে মাও জে দং-এর নেতৃত্বে শ্রমিক, কৃষক ও শহুরে পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণির মৈত্রী তাদের মুক্তি সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।<sup>১১</sup> কমিউনিস্ট পার্টি পরবর্তীকালের আত্মসমালোচনায় জানায় নিষিদ্ধকালীন সময়ে 'দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ'-এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে তারা আসলে 'বামপন্থী সুবিধাবাদ'-এর দিকে ঢলে পড়েছিল।<sup>১২</sup> বামপন্থী সুবিধাবাদের লক্ষণ হল পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবপনার ভাবাদর্শ ও মনোবৃত্তির কারণে সংকীর্ণতা ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতা।<sup>১০</sup> আত্মসমালোচনার পরে কমিউনিস্ট পার্টি শ্রেণিসংগ্রামের যে নীতি নেয় তাতে

সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে জাতীয় শ্রমিক-কৃষকের মেহনতি মানুষের সঙ্গে গ্রামীণ ও শহুরে পেটি-বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী এমনকি জাতীয় বুর্জোয়াদের মিলনের ডাক দেওয়া হয়।

ঙধু তাত্ত্বিক আদর্শ নয়, মধ্যবিত্তের কাছে বামপন্থীদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলেছিল কংগ্রেস সরকারের একাধিক ভ্রান্ত নীতি। সঙ্কটের বোঝা মধ্যবিত্তের স্বাধীনতাকে ঘিরে তৈরি হওয়া সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে দেয়। মুদ্রাক্ষীতি, মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই, বেকারত্ব, মজুরি-হ্রাস মধ্যবিত্তের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিতে শুরু করে। জীবনযাত্রার মান নামতে নামতে প্রায় সর্বহারার পর্যায়ে পোঁছে গেছে, কিন্তু মধ্যবিত্ত নীতি-আদর্শের সংকুচিত স্বার্থ তাদের অবস্থা আরও বিষাদগ্রস্ত করে তোলে। শতকব্যাপী প্রতিপালিত মিথ্যে আভিজাত্য, ঔপনিবেশিক শিক্ষা আর চিরাচরিত ঐতিহ্যবোধের সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থার সংঘাত বাঙালি মধ্যবিত্তকে আরও বিব্রত করে দেয়। কৃষক-শ্রমিকের পাশাপাশি মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যেও স্বাধীনতার প্রতি মোহভঙ্গ হওয়া শুরু করে। নতুন সমাজব্যবস্থার ডাক মধ্যবিত্তের কানে পোঁছেছিল, যদিও কয়েক দশকব্যাপী লড়াইয়ের পর সেই ডাকে সাড়া দেওয়ার মতো মানসিক শক্তি

# স্বাধীনোত্তর কালে গণনাট্য সংঘের নাটকে মধ্যবিত্ত জীবন :

স্বাধীনতার পর থেকেই গণনাট্য সংঘ কংগ্রেস সরকারের রূপ উন্মোচন করে মধ্যবিত্ত জনসাধারণকে তার প্রকৃত অবস্থান সম্বন্ধে সচেতন করতে চেয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির নিষিদ্ধ পর্বের ঝড়-ঝাপটা সামলেও এই সময়েই গণনাট্য সংঘের নাটকে মধ্যবিত্ত শক্তির শ্রেণিচেতনাকে পূর্ণ বিকাশের ডাক দেওয়া হয়। ১৯৪৮ সালে প্রযোজিত সলিল চৌধুরীর লেখা 'জনান্তিক' নাটকে সেই প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়। নাটকে দেখি এক লেখক তাঁর সাহিত্যকর্মে সমস্যাজর্জরিত জীবনের বদলে শুধুই বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের পূজা করতে চান। কিন্তু ঘরে চাল বাড়ন্ত, বাড়িভাড়া বাকি, স্ত্রী-র সঙ্গে নিত্য অশান্তি। লেখক পলাতকের মতো অতীতের সুমধুর স্মৃতিতে ডুবে যেতে চাইলে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায় পুরনো প্রেমিকা। সেই নারীর বর্তমান দীর্ণ অবস্থা দেখে তিনি ফের বান্তবের মাটিতে ফিরে আসেন। তখন

জানা যায় তাঁর একমাত্র সন্তানকে সমাজবিরোধীরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে। তিনি পালাতে চাইলেও জীবন তাঁর পিছু ছাড়ে না। বান্তব বারবার তাঁর টুঁটি চেপে ধরে। হঠাৎই একজন দর্শক মঞ্চে উঠে রাজনীতির কথা শেখানো হচ্ছে বলে গোলমাল বাঁধায়। লেখকের বিশুদ্ধ শিল্প নামক এক অলীক কল্পনা বান্তবের আঘাতে চূর্ণ হয়ে যায়; বাড়ির লোকেদের তিরস্কারে লেখক আরও স্তব্ধ হয়ে যান; দর্শক চিৎকার করে নাটকের নামে রাজনীতি প্রচারের বিরোধিতা করে। সেই মুহূর্তে বাড়ির কাজের লোকটি যবনিকা ফেলে দেয়। নাটককার বুঝিয়ে দেন আমাদের বান্তব জীবনের বিভিন্ন চক্রব্যূহ থেকে পালানোর কোনো উপায় নেই। তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে, লড়াই করতে হবে। নাহলে জীবনেরও যবনিকা নেমে আসবে।

সলিল চৌধুরীর লেখা 'সংকেত' নাটকে দরিদ্র শিক্ষক পিতা আন্দোলনের ঘোরতর বিরোধী। কিন্তু তাঁর মেজোছেলে মনে করে বর্তমান সময়ে দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য আন্দোলনই একমাত্র পথ। বড়োভাই দিল্লি সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তাঁর অভিজাত-ধনী নববধূ শিক্ষক পরিবারের দরিদ্রতাকে ঘৃণাভরে অপমান করে। ছোটো দুই ভাইয়ের রাজনৈতিক বিশ্বাসের পরিচয় পেয়ে বড়ভাই তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে। অপমানিত পিতা স্কুলে গেলে দুই ভাই বেরিয়ে পড়ে বন্দিমুক্তির মিছিলে। যেখানে পুলিশের গুলিতে নিরীহ ছোটোভাইয়ের মৃত্যু হয়। এই সংবাদ পেয়ে ভেঙে পড়ার বদলে দ্বন্দ্ব কাটিয়ে তাদের বাবাও শিক্ষক আন্দোলনকে সমর্থন করা শুরু করেন।

১৯৪৯ সালে অভিনীত অরুণ চৌধুরীর 'সব পেয়েছির দেশ' নাটকে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের বস্তিবাসী হওয়া এবং পরে সমস্ত সংস্কার ঝেড়ে ফেলে গণসংগ্রামে যুক্ত হওয়ার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

মণীন্দ্র মজুমদার রচিত 'নাগপাশ' নাটকের কাহিনি একটি দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। বাড়ির কর্তা প্রমথ এক সময়ে চাকরি করলেও বর্তমানে চুরির দায়ে অপসৃত। বড়ো ছেলে বিনয় একটি অফিসে কাজ করে কোনো রকমে পরিবারকে টিঁকিয়ে রেখেছে। অসুস্থ

ছোটো ভাই রমেনের চিকিৎসা আর বোন মঞ্জুর বিবাহ অর্থের দায়ে আটকে রয়েছে। অভাব-অনটন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রমথবাবু ফের অসৎ পথ নেওয়ার চেষ্টা করেন।

সমগ্র পরিবারটি যেন রমেনের মতো অসুস্থ হয়ে ঘরবন্দি। রমেনকে এক টুকরো চাঁদের আলোর জন্য পরনির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়। লতিকা স্বপ্ন দেখে একদিন অর্থ উপার্জন করে সে পরিবারের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে উঠবে। বিনয়ের জীবনে কোনো সাধ-আহ্লাদ নেই, স্বপ্ন নেই, সাফল্য নেই, আকাজ্জা নেই। আছে শুধু পরিবারের বড়ো ছেলে হওয়ার দায়িত্ব ও সর্বংসহা কর্তব্যবোধ। সে অমিয়কে বলে,

"তুমি দেখছ আজকের এই আমাকে। দেখছ, দিনের পর দিন মাথা নিচু করে বোঝা বয়ে চলেছি। কিন্তু আগুন যে ধুকধুক করে জ্বলছে তা জানো না। কী করব? বিয়ে করেছি— মা-বাপ মাথার ওপর, বোনের বিয়ে দিতে হবে, আর ভাই ভুগছে যক্ষায়। এ-কথা ভাবলে রক্ত আমার হিম হয়ে যায়। না হলে আমার মধ্যেও আগুন দেখতে পেতে।"<sup>38</sup>

বিনয়ের মতো অবস্থা তার অফিসের আরও ২৭৫ জনের। কিন্তু তারা গত ১২ দিন ধরে অফিসে স্ট্রাইক করছে মাইনে বাড়ানোর দাবিতে। অমিয়র ভাষায় "শুধু মাছির মতো জীবনকে ঘৃণা করি বলেই স্ট্রাইক করছি।" বিনয়ের মতো ২৫ জন তখনও 'বিশ্বাসঘাতক'-এর মতো কাজ করে চলেছে। বিনয় স্ট্রাইকে সম্মতি জানাতে পারে না। মা তাকে পরিবারের কথা ভেবে পিছু টেনে ধরে। বাবার মতে স্ট্রাইক না করে উপরওয়ালাকে খুশি করে চললে মাইনে বাড়বে।

শেষ পর্যন্ত খবর আসে কোম্পানি বিনয়সহ ৩০০ জনকেই ছাঁটাই করেছে। ভাঙনের পূর্ণ ছবিটা বিনয়ের সামনে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সমাজ ভাঙছে, সমাজ বদলাচ্ছে; মধ্যবিত্তের একক স্বার্থ বর্জন করে শ্রেণিসংগ্রামের ডাক এসে পড়েছে পরিবারটির কাছে। বিনয়ের মা বলে, "এর চেয়ে তো আর কিছু খারাপ হবে না। মানুষ পাথর নয়। সহ্য করতে করতে সে একসময় চেঁচিয়ে ওঠে।" খবর আসে ধর্মঘটে যোগ দেওয়ায় বিনয়কে কয়েদ করা হয়েছে। নতুন চেতনা লাভ করে দারুণ বিপদের দিনেও অসহায় পরিবারটি ফের একজোট হতে শেখে।

কিন্তু এক্যবদ্ধ হয়েও তারা কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায় না। তাদের মূল শক্র কে, কাদের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করতে চায় তার কোনো সুস্পষ্ট উত্তর নাটকে নেই। অফিসের স্ট্রাইকের ঘটনাটি পরোক্ষভাবে নাটকে আসার কারণে বিনয়ের মধ্যে জন্ম নেওয়া সংগ্রামী চেতনার যথার্থ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। বিনয়কে অফিস থেকে বরখাস্ত করার পরেই সে ও তার পরিবার আন্দোলনের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছে। অর্থাৎ তাদের পরিবর্তন এসেছে বাহ্যিক ঘটনার আঘাতে, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে জীর্ণ হয়ে তাদের হৃদয় থেকে শ্রেণিসংগ্রামের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন সৃষ্টি হয়নি। সমগ্র নাটকটি জুড়ে মধ্যবিত্তের দারিদ্র্যের চিত্র নির্মাণে নাটককার যতটা সচেতনতা দেখিয়েছেন, তার বিপরীতে শ্রেণিসংগ্রামের চিত্র প্রস্তুতিহীন মনে হয়।

#### দেশভাগ-মধ্যবিত্ত জনমানস ও গণনাট্য সংঘের নাটক :

আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা এসেছিল ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার রক্তমাখা পথ পার হয়ে। দাঙ্গার ভয়াবহতায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর সেদিনের মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালি দেশভাগের প্রস্তাবকেই হানাহানির আদর্শ সমাধান মনে করেছিল।<sup>১৫</sup> ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট র্য্যাডক্লিফের রোয়েদাদ বাংলাদেশকে বিভক্ত করে ধর্মীয় ভেদাভেদকে অমর করে দেয়। দেশভাগের পরের পর্যায় ছিল দেশত্যাগ। লক্ষ লক্ষ বাঙালি এক 'স্বদেশ' ফেলে আরেক 'স্বদেশ'-এর দিকে যাত্রা শুরু করে। যাত্রাপথে ফেলে এল তার ভিটেমাটি, তার পরিচিত পৃথিবী, তার 'বিধর্মী' স্বজন। দীর্ঘ সংগ্রামের পর তারা হয়তো 'বাস্তত্যাগী' অভিধাটি মুছে ফেলতে পেরেছিল, কিন্তু তার জন্য যে মূল্য তাদের বহন করতে হয়েছিল তার হিসেব করবে কে? যে বাঙালি একদিন তার শান্তির ঘেরাটোপে নিশ্চিন্ত ছিল, আজ তার জন্য বরাদ্দ হল শিয়ালদা স্টেশন বা সরকারি ক্যাম্পের অভ্যর্থনা। নতুন জীবনের সঙ্গে তার প্রাচীন মূল্যবোধ ও সংস্কারের প্রাত্যহিক ধ্বস্তাধস্তির ফলে তৈরি হল এক নতুন প্রজাতির বাঙালি। যার নাম উদ্বাস্ত। যার একমাত্র সম্বল ছিল ফেলে আসা 'দ্যাণ'-কে অপরিসীম মায়ায় আঁকড়ে ধরে বাঁচার তাগিদ।

তার ফলে গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বাস্তুভিটা' নাটকটি কলকাতা ও শহরতলির মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তু বাঙালিকে 'নস্টালজিয়া'-য় জারিত করেছিল। নাটকে মহেন্দ্র মাস্টার দেশত্যাগ করতে চাইলেও মুসলিম জনসমাজ সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে তাঁর পথরোধ করে। মহেন্দ্র মাস্টারের মতো সৌভাগ্য হয়নি বলেই তাদের গায়ে আজ 'উদ্বাস্তু'-র তকমা। কিন্তু সেই সৌভাগ্যের স্বপ্ন বুকে প্রতিপালিত করত বলেই মধ্যবিত্ত কলোনিগুলিতে 'বাস্তুভিটা' নাটক প্রবল জনপ্রিয় হয়েছিল।<sup>১৬</sup>

#### শিক্ষক আন্দোলন এবং গণনাট্য সংঘের নাটক:

স্বাধীনোত্তর কালে বাংলার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা শিক্ষক আন্দোলন। এই আন্দোলনের গুরুত্ব শুধুমাত্র তার সাফল্য-ব্যর্থতা ও জনসমর্থনের উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়নি। বরং 'মানুষ গড়ার কারিগর', 'নিঃস্বার্থ' শিক্ষকরা নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য যে পথ অবলম্বন করেছিলেন তা পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে। শিক্ষকদের আন্দোলনের পথ নিয়ে বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়েছিল। তাছাড়া শিক্ষক আন্দোলন স্বাধীন ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থার চরমতম ত্রুটি ও বৈষম্যের দিকটি জনসমক্ষে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল। বাংলার অধিকাংশ শিক্ষকই ছিলেন মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত। ফলে শিক্ষক আন্দোলনের প্রতি দায়বদ্ধ হয়ে ওঠার জন্য তাদের তথাকথিত শিক্ষক-সুলভ ভাবমূর্তি ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিচেতনা উভয়ের বিরুদ্ধেই লড়তে হয়েছে।

১৯৫৪ সালের শিক্ষক আন্দোলন পূর্বসূরিহীন বিচ্ছিন্ন আন্দোলন ছিল না। স্বাধীনতার পূর্বে অবিভক্ত বাংলায় শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন, বেতন বৃদ্ধি ও বৈষম্য দূরীকরণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষকরা আন্দোলন করেছিলেন। দীর্ঘ ২৬ দিন আন্দোলনের পর ১৯৪৭ সালের ১ এপ্রিল লিগ মন্ত্রীসভা প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়।<sup>১৭</sup> নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বাধীন ১৯৫৪ সালের শিক্ষক আন্দোলনেরও মূল দাবি ছিল বেতনবৃদ্ধি। সেই সময়ে কলকাতার ১২৪টি শিক্ষক পরিবারে সমীক্ষা করে জানা যায় একটি মধ্যবিত্ত শিক্ষক পরিবারের মাসিক খরচ আয়ের তুলনায়

২২ শতাংশ বেশি। শহরে শতকরা ৮৬টি পরিবারের গড় ঋণের পরিমাণ ৭৬৪ টাকা।<sup>১৮</sup> যদিও অর্থের পরিসংখ্যান দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দৈনন্দিন জীবনযন্ত্রণা সম্পূর্ণ তুলে ধরা সম্ভব নয়।

১৯৫৪-র ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শিক্ষকরা অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘট ঘোষণা করেন। ১৯৫৩-র ট্রাম-আন্দোলনের থেকেও শিক্ষক আন্দোলনের পরিসর বৃহৎ ছিল—প্রায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী। সারা রাজ্য জুড়ে ছাত্র, অভিভাবক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার, স্বাক্ষর ও অর্থ সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। বিভিন্ন বামপন্থী রাজনৈতিক দল, কৃষকসভা, ছাত্র ফেডারেশন, ইউসিআরসি, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠনও তাদের সমর্থনে এগিয়ে আসে।

আন্দোলনের প্রথম দিন থেকেই শিক্ষক-শিক্ষিকারা ব্যাপক জনসমর্থন পান। দ্বিতীয় দিন থেকে ৩০০০ শিক্ষক-শিক্ষিকা রাজভবনের পূর্বদিকে অবস্থান করা শুরু করেন। ১৬ তারিখ ১০০০০ লোকের মিছিল রাজভবন অভিমুখে যাত্রা করলে পুলিশ লাঠি, টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করে তাদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। সেদিনের সংঘর্ষে ৫ জন মারা যান, ৩০ জন আহত হন, ৬টি সরকারি বাস ও ৭টি ট্রামে আগুন লাগানো হয়। বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক কর্মী ও ৩০০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে গ্রেপ্তার করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহার্ঘ্য ভাতার আবেদন মেনে নিলে এবং আন্দোলনের বন্দিদের মুক্তি দিলে কলকাতার অবস্থা ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে আসে।<sup>১৯</sup>

শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে গণনাট্য সংঘ ও বামপন্থী শিল্পীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, দিনেশ দাস, শ্যামল মিত্র, খালেদ চৌধুরীর মতো প্রখ্যাত ব্যক্তিরা আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস এই আন্দোলন নিয়ে গান বেঁধেছিলেন, "তুমি যে জ্বেলেছ দ্বীপ"।<sup>২০</sup> শিক্ষক আন্দোলন নিয়ে রচিত সুনীল দত্তের 'হরিপদ মাস্টার' নাটকটি গণনাট্য সংঘ ১৯৫৪ সালে প্রযোজনা করে।

হরিপদ মাস্টার মফস্বল অঞ্চলের একজন দরিদ্র আদর্শপ্রাণ শিক্ষক। স্কুলের সামান্য মাইনে ও টিউশনি পড়ানোর অর্থে কোনোরকমে তাঁর সংসার চলে। তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য স্কুলের প্রধান শিক্ষক হওয়া। শুধুমাত্র সম্মানের জন্য নয়, প্রধান শিক্ষক হলে তাঁর মাইনে বাড়বে।

শ্বশুরবাড়িতে পণের জন্য অত্যাচারিত মেয়ে, অর্থের জন্য উচ্চশিক্ষা আটকে যাওয়া ছেলের মুখে হাসি ফুটবে। একসময়ে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনে জেল খাটা হরিপদ মাস্টারের বর্তমান অবস্থা আমাদের অবাক করে। আদতে নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে মানসিক দীনতার যে আস্তরণ পড়েছিল হরিপদবাবুর চিন্তা-চেতনা তার দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। তিনি প্রতি মুহূর্তে সবাইকে বোঝাতে চান যে কর্তৃত্ব ও অর্থের জন্য তিনি প্রধান শিক্ষকের পদ চাইছেন না। অথচ আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যকে সুখের একমাত্র মাপকাঠি ধরে তিনি মেয়েদের পাত্রপক্ষের পণপ্রথার বর্বরতার মুখে ঠেলে দিয়েছেন। অভাব-অনটনের মধ্যেও বিস্তর আয়োজন করে ধনী পাত্রপক্ষকে খুশি করার ব্যর্থ চেন্টা করেছেন। ফল কী হয়েছে? বড় মেয়ে আত্মঘাতী ও ছোটো মেয়ে শ্বশুরবাড়ির সেবাদাসী। যন্ত্রণায় ভুগলেও মুখ ফুটে তিনি ব্যর্থতার দায় স্বীকার করেননি। বড় ছেলে বিমল বাধা দিলেও তিনি শোনেননি। কারণ তিনি মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের দোষগুণরহিত সর্বময় কর্তৃত্বের সার্থক উত্তরসূরি।

আজ শিক্ষক আন্দোলন তার জীবনে ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ করে মানুমের পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ এনে দিয়েছে। উপনিবেশিক শিক্ষার 'বুর্জোয়া' মানসিকতার জন্য শিক্ষক আন্দোলনের প্রতি তার বিরাগ থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ তার 'শিক্ষক' সত্তাকেই ছোটো করে দেয়। তিনি দেখেছেন ক্ষুলের সেক্রেটারি প্রতি মাসে সরকারকে ঠকিয়ে গাড়ি-বাড়ি করছে। তিনি দেখেছেন তার সহকর্মী সত্যবাবু অভাবের জ্বালায় ক্ষুধার্ত সন্তানদের নিয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন। আর প্রশ্নটা তো শুধু শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধি ঘিরে নয়; একটি সুন্দর শিক্ষাব্যবস্থা নির্মাণেরও। তার ছেলে বিমল শিক্ষিত হয়েও বেকার। ছোটো ছেলে অমলকে তার পিতার আচরণের জন্য গঞ্জনা শুনতে হয়। তিনি স্বীকার করে নেন যে তার ছেলেদের তিনি শিক্ষক হতে উৎসাহিত করবেন না। বামপন্থী শিক্ষক কেষ্টবাবুর আন্দোলনের যুক্তি তিনি অস্বীকার করেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অদ্রুতভাবে নীরব থাকেন।

"সত্য: শিক্ষকেরাই তো জাতীয় গঠনকর্তা। তারাই গড়ে তোলে ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, দেশের নেতা, কবি, শিল্পী সাহিত্যিক। অথচ সেই মানুষদেরই করা হয় সবচেয়ে বেশি অবহেলা—কেন বলতে পারেন?

কেষ্ট: ঐ একটা প্রশ্নকে সামনে রেখেই তো আজ মাস্টারমশাইরা এতদূর এগিয়েছেন সত্যবাবু! ওখানে তো তারা রাজ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে যায়নি। তারা গেছে কিছু চাওয়ার ভরসায়। কিছু পাবার আশায়। তাই তো রাতের পর রাত, দিনের পর দিন, সংসারের মায়া ত্যাগ করে বসে আছেন অসংখ্য মাস্টারমশাই।"<sup>২১</sup>

নাটকের শেষ অংশে তিনি খবর পান তাঁর প্রধান শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং পুলিশের গুলিচালনায় তাঁর প্রিয় ছাত্র মুকুলের মৃত্যু হয়েছে। হরিপদ মাস্টারের ভগ্নকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ধ্বনিত হয় 'ওরে ভয় নাই, নাই মেহমোহবন্ধন/ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা'। কিন্তু নাটকের শুরুতে হরিপদবাবু যে কবিতা আবৃত্তি করেন, সন্তানসম ছাত্রের মৃত্যুতেও একই আবৃত্তিতে তার হৃদয়ের হতাশার দ্যোতনাই প্রকাশিত হয়। নাটকের আদ্যোপান্ত জুড়ে উচ্চাশা প্রত্যাশী হরিপদ মাস্টার হেডমাস্টার না হতে পারার যন্ত্রণায় ঈর্ষান্বিত হন না, বরং সমাজবদলের ঘোষক হয়ে ওঠেন। নাটককার শিক্ষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শ্রেণিসংগ্রামের বাতাবরণ সমগ্র নাটকজুড়ে কৃতিত্বের সঙ্গে নির্মাণ করেন, কিন্তু শেষ ভাগে বাহিক সংঘাতের বাড়বাড়ব নাটকের সমাপ্তিকে অতিনাটকীয় করে তোলে। একইভাবে দেখতে পারি বেকারত্বের যন্ত্রণায় আত্মঘাতী হতে যাওয়া বিমল একজন কুলির মুথে শুধুমাত্র সংগ্রামের বাণী শুনে জীবনীশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠে। সমগ্র নাটকজুড়ে কেষ্টবাবুর আন্দোলনের সমর্থনে ব্যয় করা বাক্যগুলি রাজনৈতিক স্লোগানে পরিণত হয়। ফলে নাটকটিতে শিক্ষক আন্দোলনের সার্বিক পরিপ্রেক্ষিত ও হরিপদ মাস্টারের সংকীর্ণ মধ্যবিত্ত স্থাণ্টিন্তার দ্বন্দ্বের সার্থক নির্মাণ শেষ পর্যন্ত সারবন্ত্রে হিল্ল মন্ত্য বেয়ে সিংরীন্বে সার্থান্র বন্ধের সার্থক নির্মাণ শেষ পর্যন্ত সার্হান্তর হার বান্টা হয়ে পডে।

## পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও মধ্যবিত্ত জীবনযন্ত্রণা :

বিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশকের মধ্যভাগ থেকে কলকাতা শহর ক্রমে 'মিছিল নগরী' হয়ে উঠতে শুরু করে। ট্রাম আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন, বাস্তুহারা আন্দোলন, বঙ্গ-বিহার সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন, গোয়ামুক্তি আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলনসহ অন্যান্য আরও অসংখ্য ছোটো-বড়ো বিক্ষোভ,

অবরোধ, ধর্মঘট কলকাতাকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল। ১৯৫১ সালে ভারত সরকার প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ১৯৫৬ সালে। দুটি ক্ষেত্রেই মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনযাত্রায় বিরাট কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। বরং শ্রমিক-কৃষকদের জনবিরোধী নীতি বাজার অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, ছাঁটাইয়ের কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন জেরবার হয়ে যায়।

বেকারত্বের সমস্যা শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে ব্যাপকভাবে আঘাত করেছিল। যা এদেশের যুবসম্পদকে চূড়ান্ত হতাশার দিকে ঠেলে দেয়। কলকাতা শহর—যা কিনা রাজ্যের শিল্প-সমৃদ্ধির কেন্দ্রভূমি, সেই শহরে যুবক-যুবতীদের বেকারত্বের হার ছিল যথেষ্ট আশঙ্কাজনক। কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম থেকেই এ বিষয়ে অত্যন্ত সরব ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে 'পশ্চিমবঙ্গ স্বাধীনতা বার্ষিকী—১৯৫৫ সাল'-এর তথ্য উদ্ধৃত করে বলা হয়েছিল,

"এই রাজ্য আজ উদ্বেগজনক বেকার সমস্যার সম্মুখীন—বিশেষ করিয়া শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বেকারসমস্যা। ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে বেকারসমস্যার যে পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা হয়েছে, তাহাতে দেখা যায় যে কলিকাতায় প্রতি ১০০ জন কর্মনিযুক্ত ব্যক্তি পিছু ২৭.৩ জন ব্যক্তি কর্মহীন ও কর্মপ্রার্থী। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে বেকারসমস্যার হিসেব দেখা যায় যে কলিকাতায় প্রতি ১০০ জন কর্মনিযুক্ত ব্যক্তি পিছু কর্মহীন ব্যক্তির সংখ্যা ৪৭ জন।"<sup>২২</sup>

আরেকটি রিপোর্টে কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৫৫ সালের সরকারি প্ল্যানিং কমিশনের পরিসংখ্যানসহ অভিযোগ করেছিল যে শহরে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সের কর্মপ্রার্থীদের শতকরা ৬৩ ভাগ বেকার। ২৫ থেকে ৩৪ বছরের শিক্ষিত কর্মপ্রার্থীদের ১১ শতাংশের জন্য কোনো কর্মখালি নেই। কিংবা যে ধরনের কর্মে তারা যোগ দিচ্ছে, তাতে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রকৃত মূল্যায়ন হয় না। একজন শিক্ষিত যুবক বা যুবতীকে তার যোগ্যতামান অনুযায়ী চাকরি পাওয়ার জন্য ন্যূনতম সাত বছর অপেক্ষা করতে হয়। প্রতি বছর উত্তরোত্তর অপেক্ষাপ্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।<sup>২৩</sup>

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ও উদ্যোগী পুঁজিবাদী শক্তির সমর্থনে ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রসারলাভ ঘটে। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরাও ট্রেড ইউনিয়নের পথ অবলম্বন করায় সরকার কিছুটা নত হয়। তবে রাজ্যের বেকার সমস্যার সার্বিক উন্নতি ঘটেনি। কমিউনিস্ট পার্টি অভিযোগ করে যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে ২ লক্ষ ৩৫ হাজার নতুন পদ সৃষ্টির লক্ষ্য থাকলেও রাজ্য জুড়ে অন্তত ১৮ লক্ষ বেকারের পক্ষে সেটা যথেষ্ট নয়।<sup>২৪</sup> অবশ্য ঘোষণা আর কর্মব্যবস্থা সম্পাদনের জন্য সরকারের সদিচ্ছা, স্বচ্ছতা ও বান্তব পরিস্থিতির মধ্যে বিস্তর ফারাক থেকে যায়। এর সঙ্গে নারীশিক্ষা, নারীস্বাধীনতা ও নারীদের কর্মসংস্থানের অবস্থা বিবেচনা করাও এক্ষেত্রে জরুরি। সামাজিকভাবে কন্যাপণ, গোঁড়া পুরুষতান্ত্রিকতা, নারীস্বাধীনতার অভাব, লিঙ্গ বৈষম্য বিরাট সমস্যা ছিল। অর্থনৈতিকভাবে নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রেও নানা বাধা ছিল। একটি পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, ১৯৫৪ সালে ৬৭৭৭ জন নার্সিং পাস করা নারীর মধ্যে মাত্র ৩৬০৩ জন চাকরি পান। মাধ্যমিক স্কুলে পুরুষ শিক্ষকের সংখ্যা যেখানে ৩৪,৩০৪ জন, সেখানে মেয়েদের সংখ্যা ৪৫০০ জন।<sup>২৫</sup>

ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে দ্রব্যমূল্যের সূচক। খাদ্যসংকট বিষয়ক আলোচনায় আমরা দেখেছি খাদ্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি রাজ্য জুড়ে পুনরায় দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। ১৯৫৩-৫৮ পর্যন্ত খাদ্যসামগ্রী ও কাপড়ের পাইকারি মূল্য বেড়েছে প্রায় ৩০ শতাংশ। অথচ এর বিপরীতে মানুষের মাসিক আয়ের পরিমাণ কমতে থাকে। ১৯৬০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু মাসিক আয় ৩৩ টাকা। যার মধ্যে শহুরে নিম্নমধ্যবিত্তদের শতকরা ৩০ জনের মাথাপিছু আয় ২০ টাকা। সরকারি ও বেসরকারি চাকরি প্রাপ্ত কর্মচারীদের ৬৬ শতাংশের মাসিক আয় ৫০ টাকা মাত্র।<sup>২৬</sup>

অর্থনৈতিক দুরবস্থার সঙ্গে আসে মানসিক হীনতা। সরকারি নীতি প্রয়োগে হয়তো কম সময়ে অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব, কিন্তু মানসিক অবক্ষয় থেকে একটি সমাজকে মুক্ত করা দীর্ঘমেয়াদি পরীক্ষা। বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণিকেই মানসিক অবক্ষয়ের সব থেকে বড় শিকার হয়েছিল। জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক অবনমনের সঙ্গে রুচি ও নীতির সামঞ্জস্য না হওয়ায় জন্ম হয়েছিল

আদর্শহীনতার। ঔপনিবেশিক শিক্ষার কারণে তাদের পক্ষে সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণার মানসিক শক্তি আয়ত্ত করা মুশকিল ছিল। স্বাধীনতার স্বপ্নভঙ্গ হওয়ায় আদর্শগতভাবে তার দাঁড়ানোর জায়গা ছিল না। ফলে আর্থিক সংগতি ও মানসিক শক্তির অভাবে মধ্যবিত্ত সমাজের বড়ো অংশে প্রাচীনপন্থী কুসংস্কারগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। পুরুষতান্ত্রিক একনায়কত্ব, লিঙ্গবৈষম্য, অতীতচারিতা, নিয়তি সর্বস্বতা, মেকি আভিজাত্যের ফাঁপা বুলি মধ্যবিত্ত অবক্ষয়কে তাদের অজান্তেই আরও বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিল।

### গণনাট্য সংঘের নাটকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনযন্ত্রণা :

মধ্যবিত্ত শ্রেণির এই অবক্ষয়ের চিত্র গণনাট্য সংঘের নাটকে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। একই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার দুর্বিষহ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। গণনাট্য সংঘ তাদের নাটকে বামপন্থী শ্রেণিআন্দোলনের আদর্শে বহুমুখী বিপদের বিরুদ্ধে মুক্তির নিশানা দেখানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল।

ভানু চট্টোপাধ্যায়ের 'আজকাল' নাটকের (প্রযোজনা ১৯৫৩) অবিনাশ চক্রবর্তী সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির শেষ ধ্বজাধারক। চক্রবর্তী বংশ এক কালে এতদাঞ্চলের জমিদার হলেও আজ সর্বস্ব খুঁইয়ে ভাড়াবাড়িতে আশ্রয়প্রার্থী। তার বড় ছেলে অমল গত আট মাস ধরে বেকার, পরিবারকে না জানিয়ে সে হাজার-হাজার টাকা দেনা করে সংসারে যোগান দিচ্ছে। পুত্রবধূ রমা অন্যের বাড়ি থেকে চাল 'ধার' করে আনে, আরেক ছেলে অশোকও বেকার, মেয়ে লতার বিবাহ আটকে আছে অর্থের দায়ে, বাড়িওয়ালা ভাড়ার টাকার জন্য শাসানি দিয়ে যায়। তবুও অবিনাশবাবু পরিবারের বংশমর্যাদা ও সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন না। তাই বংশ-মর্যাদার দোহাই দিয়ে রমার নিয়ে আসা চাল ফেরত পাঠানো হয়। মেয়ে লতার স্বাবলম্বী হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার পুরুষতান্ত্রিক গোঁড়ামি। বাড়িওয়ালার গঞ্জনায় তিনি মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র পরিবারে নিয়ে কুলিবন্তিতে উঠে যাওয়ার হঠকারি সিদ্ধান্ত নেন। আজ তিনি সর্বস্ব হারিয়েছেন, তবু জমিদারতন্ত্রের একক কর্তৃত্বের রাশ আলগা করেন না। তিনি কারোর সঙ্গে আলোচনা করেন না, অন্যের মতামতের

শুরুত্ব দেন না। সামান্য আঘাতেই তাদের ক্ষয়িষ্ণু আভিজাত্য যুক্তি-বুদ্ধি হারিয়ে প্রাচীন অহং-এর কাছে আত্মসমর্পণ করে। লতা চাকরি করতে চাইলে তিনি পুনরায় পূর্বপুরুষের বংশমর্যাদার দোহাই দিয়ে তাকে বাড়ি ত্যাগ করতে বলে। যাওয়ার আগে লতা বলে যায়, "মিথ্যে আভিজাত্যের মোহ যদি না ভাঙে তো একদিন সবাই ওঁকে ছেড়ে চলে যাবে।"

একই প্রবণতা আমরা দেখতে পাই অবিনাশবাবুর পরবর্তী প্রজন্ম অমলের মধ্যে। তার আকস্মিক বেকারত্বের কথা সে তার স্ত্রী বা পরিবারকে জানতে দেয়নি। এক মিথ্যে অহং-এর বশবর্তী হয়ে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার সঙ্গে পরিবারের একমাত্র অর্থের সম্পর্ক। পরিবারের বিপদকালে পলায়নপর অমল সমস্ত ঋণের বোঝা একার কাঁধে তুলে পরিবারকে অকৃতজ্ঞ প্রমাণ করার দুঃখবাদী আত্মপ্রসাদ উপভোগ করেছে। যদিও পুঁজিবাদের সঙ্গে নতুন বন্ধুত্বের কারণে তার নিয়তি তাকে পরিবারের থেকে আলাদা করে দেয়। অর্থনৈতিক দৈন্যতা অমলকে নিয়ে গেছে চোরাবাজারির অন্ধগুহায় আর অবিনাশবাবুকে ঠেলে দিয়েছে চূড়ান্ত উন্মত্ততায়। একদিকে অবিনাশবাবু মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে কুলির কাজ করার জন্য সারাদিন স্টেশনে পড়ে থাকেন। অন্যদিকে অমল তার বন্ধু সুবিনয়ের চালের চোরাকারবারির দায়িত্ব সামলে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা শুরু করে। অর্থের সমুদ্রে সাঁতার কেটেও অসুখী অমল আজ তার পরিবারের কুলিবস্তির ঘরে ফিরতে চায়। সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার রুগ্ন স্ত্রী রমা। প্রিয় মানুষের আর্থিক অধঃপতন মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু মানসিক-চারিত্রিক অধঃপতনে ভালোবাসার অবকাশ থাকে না। ফলত তার ঘরে ফেরার স্বাদ অপূর্ণ থেকে যায়। গ্রামের অন্নসমস্যার কারণ হয়ে ওঠা সুবিনয়ের চোরাকারবারের সাহচর্য অমলকে তার স্ত্রী রমার থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। যদিও পরিবারের পুরুষতন্ত্রের কাছে অবদমিত রমা কীভাবে এই মানসিক দৃঢ়তা অর্জন করল তার সদুত্তর আমরা নাটকে পাই না।

নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে ঘটনাক্রম ও গতি আকস্মিকভাবে বদলে যায়। যে কাহিনি ছিল একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযন্ত্রণার ইতিবৃত্ত, তা গ্রামের অন্নসমস্যার সঙ্গে জুড়ে যায়। অশোক আচমকা বামপন্থী চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে গ্রামের মানুষের আন্দোলনের নেতা হয়ে ওঠে। সুবিনয়ের সঙ্গে গ্রামের মানুষদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে নাটকটি শেষ হয়। চক্রবর্তী পরিবারের বাকি সদস্যরাও সংঘাতে

জড়িয়ে পড়ে। ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে তারা একত্রিত হলেও মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে, মানুষকে পাশে নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ লড়াই তাদের শ্রেণিচেতনার পরিবর্তন এনে দেয়। মধ্যবিত্ত সংস্কার, মেকি আভিজাত্য ঝেড়ে ফেলে অবিনাশবাবু মানসিক ভারসাম্য ফিরে পান। তার শেষ আশাটুকু বাংলার লক্ষ লক্ষ মধ্যবিত্ত পরিবারের সংগ্রামের সম্বল হয়ে ওঠে,

"আর কিছু চাই না—আর কিছু না। পেট ভরে খেয়ে শুধু বেঁচে থাকতে চাই। ছেলেমেয়েদের মুখে দুমুঠো তুলে দিয়ে, বউঝির লজ্জা বাঁচিয়ে শুধু বেঁচে থাকতে চাই। আমাদের মাটির ঘরে শুধু শান্তিতে বেঁচে থাকতে চাই।"<sup>২৭</sup>

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মোকাবিলা' নাটকটিতে উপস্থাপিত শ্রেণিসংগ্রামের চিত্র শ্রমিক-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আলোচনা করেছি। কেরানি বিশ্বনাথবাবুর মেজো ছেলে মনোজিত ট্রাম-কোম্পানিতে চাকরি পাওয়ার কারণে তার রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বামপন্থী চেতনার ছোঁয়া লেগেছে। কিন্তু মনোজিত ও বড় দিদি আরতি ভিন্ন পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা মধ্যবিত্তসুলভ সংকীর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষার অদৃশ্য সুতোয় দোদুল্যমান। বিশ্বনাথবাবুর বড়ো ছেলে সত্যজিৎ পিতার নিত্য সংগ্রাম সম্পর্কে উদাসীন ও ভাই সম্পর্কে অদ্ভুত হীনমন্য। সত্যজিৎ তার বিপ্লবী সিনেমা বানানোর 'স্বপ্ল' পূরণের জন্য পরিবারের শত্রু সদ্য পুঁজিপতি কালীনাথের সঙ্গে সমঝোতা করতে চায়। পরিবারের ছোটো মেয়ে কণিকা সিনেমায় অভিনয় করার চক্রে ক্রমশ বিপথগামী হয়ে পড়ে। মধ্যবিত্ত মানুষের 'রূপোলি ভবিষ্যৎ'-এর প্রতি আদিগন্ত লোভ আর বেঁচে থাকার দায়বদ্ধতার সংঘর্ষে জাত দ্বন্দ্বের সুযোগ নিতে চেয়েছিল কালীনাথ। কিন্তু পিতার অপমান কণিকার হৃদয়ে চাপা পড়ে যাওয়া মৃল্যবোধকে জাগিয়ে তুলে পারিবারিক আশ্রয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

সবথেকে বেশি দুরবস্থার শিকার বিশ্বনাথবাবু স্বয়ং। প্রাচীনপন্থী মানুষটি কখনই তার নীতি-আদর্শের সামনে নমনীয় হতে পারেন না। ছাব্বিশ বছর কাজ করার পর কোম্পানির কাছে 'লয়াল' থাকার জন্য তিনি দাসখতে স্বাক্ষর করেননি। কালীনাথের দেওয়া টাকার মধ্যে ঘুষের গন্ধ পেতেই তিনি টাকা ফিরিয়ে দেন। বদলে তিনি বৃদ্ধ বয়সে বেকার হলেন, মেয়ে কণিকার জন্য সম্মান

হারালেন, ব্যাঙ্ক ফেল করায় ন্যূনতম সম্বলটুকু হারালেন এবং সবশেষে পুলিশ এসে তার সন্তানদের গ্রেপ্তার করল। অথচ বিশ্বনাথবাবুদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারের অর্থনৈতিক-সামাজিক বিপর্যন্ত হওয়ার প্রতিশ্রুতি তো স্বাধীন দেশের সরকার দেয়নি। গোয়েন্দা-পুলিশ গর্ব করে জানায়, "মিডলক্লাসের কতগুলো আনএম্পপ্লয়েড ইয়ুথ হৈ-চৈ কচ্চে। Five Year Plan Complete হোক, দেখবেন এ সমন্ত হৈ চৈ আর কিছু থাকবে না।" বান্তবে দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রয়োগের পরেও যুবকরা চাকরি পায়নি। মধ্যবিত্ত জীবনের যন্ত্রণাও কমেনি। সেই জীবনযন্ত্রণা বিশ্বনাথবাবুকে পুলিশের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করার সাহস জুগিয়েছিল। কিন্তু প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার পার্থক্যের কারণে তিনি শ্রেণিসংগ্রামে শামিল হতে পারেননি। যা তার ছোটো ছেলে মনোজিত পেরেছে। যে চেতনার ঢেউ আরতি আর দীপকের মধ্যেও লেগেছে। কিন্তু প্রাচীনপন্থী বিশ্বাসের জন্য বিশ্বনাথবাবু সচেতন হয়েও মধ্যবিত্তসুলভ দ্বিধাকে আঁকড়ে ধরে স্থবির হয়ে গেছেন। আর মনোজিত-আরতি-দীপকরা স্বেচ্ছায় দিনবদলের পথে পা বাড়িয়ে নতুন ভবিষ্যতের ইন্সিত দিয়েছে।

১৯৫৮ সালে প্রযোজিত অমর গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'জীবন যৌবন' নাটকটিতে কয়েকজন বন্ধু একটি রেস্টুরেন্টে একত্রিত হয়। নাট্যকার রথীনের পারিবারিক জীবন অভাবগ্রস্ত। তার বোন শ্যামলী যক্ষায় আক্রান্ত। 'পথভ্রস্ট' রথীনের মনে হয় তার 'ড্রামাহীন ট্রাজেডি' পারিবারিক জীবনে সে একটি 'ট্রাজিক রিলিফ'। একদিন তার মনে হয়েছিল নাটকের মাধ্যমে জীবনযুদ্ধে রক্তাক্ত মানুষের মুখে সে প্রতিবাদের ভাষা তুলে দেবে। আজ মনে হয় তার নাটকের সমস্ত ভাষা দুর্বোধ্য অক্ষরের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। আরেক বন্ধু রাজীব একসময়ের সফল উকিল বর্তমানে উন্মাদ। তাদের আলোচনাচক্রে সব থেকে অদ্ভুত চরিত্র হল সলিল। তার ব্যক্তিজীবনের যন্ত্রণা ভুলতে সে হাসিমুখে মদকে সঙ্গী করে নিয়েছে। সে বোহেমিয়ান চরিত্র হয়ে অবক্ষয়িত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা দুর্দম প্রতিবাদ জানিয়ে যেতে চায়। সদ্য চাকরি পাওয়া বন্ধু শংকর রথীনের বোন শ্যামলীকে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে চায়। রথীনের মনে হয় অসুস্থ শ্যামলীকে ভালোবেসে শংকর হয়তো দয়া দেখাতে চাইছে। রথীন তার নিজের জীবনস্পৃহার অভাব দিয়ে সমগ্র দুনিয়াকে মাপতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত শংকরের ভালোবাসার দৃঢ়তা ও সলিলের অফ্রুরম্ভ জীবনীশক্তির কাছে পরাজিত হয়ে সে জীবনের

প্রতি আস্থা ফিরে পায়। যদিও সলিলের মতো মদ্যপ, বোহেমিয়ান চরিত্রের মাধ্যমে জীবনীশক্তির উম্বেষ ঘটানো নীতিগতভাবে আদৌ গ্রহণযোগ্য কিনা সেই প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়। একাঙ্ক নাটকের গতি বজায় থাকলেও চরিত্রগুলির অতীত জীবন ও রথীনের চেতনার পরিবর্তন আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয়।

মনোরঞ্জন বিশ্বাস রচিত 'কর্মখালি' নাটকটিতে বেকার জীবনের যন্ত্রণা ও বেকারত্বের কারণে মনুষ্যত্বের অবক্ষয়ের দিকটি উঠে এসেছে। একটি সরকারি অফিসে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে কয়েকজন বেকার যুবক উপস্থিত হয়। তাদের মধ্যে একজন চঞ্চল চ্যাটার্জি নিজেকে কলকাতার এক বড় ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান বলে পরিচয় দিলেও পরে জানা যায় সে গরিব উদ্বাস্ত পরিবারের সন্তান। অনিমেষ নিজেকে বর্ধমানের জমিদার পরিবারের সন্তান বলে পরিচয় দিয়েছিল। আসলে অনিমেষও অত্যন্ত গরিব এবং তাদের পরিবার উল্টোডাঙার বস্তিতে থাকে। কিন্তু চঞ্চল ও অনিমেষ দুজনেই বংশ-পরিচয়, পিতৃ-পরিচয় লুকিয়ে নিজেদের নিম্নমধ্যবিত্ত সন্তার প্রতি ঘৃণা উগড়ে দিয়েছে। চাকরির জন্য গ্রাম থেকে আসা মাধব ও অফিসের নিচু স্তরের কর্মচারী বংশীকে তাদের ঠাট্টা ও লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছে। একই রকম ঠাট্টা করতে দেখি অফিসের অ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ অফিসার ও ডিরেক্টর জেনারেলকে। নাটককার দেখাতে চান কীভাবে চঞ্চল-অনিমেষদের অর্থনৈতিক অভাব ও মানসিক হীনমন্যতা তাদের মধ্যে 'বুর্জোয়া' চরিত্রের কুৎসিত দিকগুলির জন্ম দিয়েছে।

অফিসের দুই দুর্নীতিগ্রস্ত কর্তাব্যক্তি সিনহাবাবু ও গড়গড়িবাবুর 'বুর্জোয়া' মানসিকতা শুধুই প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্ম দিয়েছে। পারিবারিক সম্পর্ক, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা তাদের কাছে স্বার্থ ও অর্থনৈতিক উন্নতির সোপান মাত্র। বর্তমান ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া নেহাত লোকদেখানো, আদতে স্বজনপোষণ করে পুরোটাই পূর্বনির্ধারিত। তাদের পক্ষে মাধবের মতো 'গ্রাম্য' সরল যুবককে বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন করে বিতাড়িত করতে অসুবিধা হয়নি। কিন্তু বামপন্থী পরিতোষকে কথার জালে জড়িয়ে বোকা বানানো সহজ নয়। মিঃ সিনহা তখন তার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করেন, ''আপনি কমিউনিস্ট!'' ভেঙে পড়া মাধবকে পরিতোষের সান্ধনা দেওয়ার মাধ্যমে নাটকটি শেষ হয়.

"সংসারে একটু সুখ, একটু স্বাচ্ছন্দ্য, একটু আনন্দ—মাধববাবু বোনেদের এই স্বপ্ন, মায়েদের এই প্রতীক্ষাকে কিছুতেই ব্যর্থ হতে দেবেন না—কিছুতেই না, কিছুতেই না।"<sup>২৮</sup>

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও' নাটকের যতীন মধ্যবিত্ত জীবনযন্ত্রণার প্রতীক। অভাব, অফিসের ইঁদুর-দোঁড়, সাংসারিক অশান্তি, বাইরের রাজনীতি সবকিছু তাকে চাহিদা-যোগানের মধ্যে ভারসাম্যকারী যন্ত্রে পরিণত করে। তার নিজের সুখ-সাধ্য-আহ্লাদ কিছু নেই। সে বলে,

"কেউ একটা হেসে কথা বলে না হে! ভাবে, কেন ব্যাটা তো বেশ আছে। কাউকে এসব কথা বলতে গেলে হেসে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু বলো, আমিও তো একটা জ্যান্ত মানুষ— আমারও তো সুখ সাধ বলে কিছু থাকতে পারে!"<sup>২৯</sup>

সংসারের প্রাত্যহিক পৌনঃপুনিকতায় ক্লান্ত যতীন আত্মহত্যা করতে চায়। বন্ধু মহেশ সেন তাকে আশ্বস্ত করে জীবনের পথে ফিরিয়ে আনে। কিন্তু যতীন নতুন উদ্যমে বাড়ি ফেরার পথ ধরতেই মহেশ নেহাৎ 'বন্ধুত্বের খাতিরে' একের পর এক কাজের ফিরিস্তি তার উপর চাপিয়ে দেয়। রাগে-ঘৃণায়-ক্ষোভে যতীন প্রায় বদ্ধপাগলে পরিণত হয়। নাটকটিতে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কৌতুকের সাহায্যে মধ্যবিত্ত জীবনযন্ত্রণার মধ্যে একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষের মানসিক স্বাস্থ্যের অনালোচিত দিকটি তুলে ধরেন। কিন্তু নাটকটিতে কোন বলিষ্ঠ মতাদর্শ নেই, ফলে যতীন তার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায় না। সুধী প্রধানের মতে অতিদীর্ঘ সংলাপের কারণে নাটকটি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নাট্যব্যক্তিত্বের দ্বারা অভিনয় করা সম্ভব হলেও অন্য দলগুলির পক্ষে কষ্টসাধ্য হতে পারে।<sup>৩০</sup>

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের অ্যাবসার্ডধর্মী 'একটি যুদ্ধের ইতিহাস' নাটকটি ১৯৬৪ সালে প্রযোজিত হয়। অনন্ত অসহায় বেকার যুবক—কিন্তু তার একটা স্বাধীন মতামত আছে, স্পষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ আছে। বড়ো কোম্পানির মালিক অসীম শুধু চায় অনন্তের মতামতটুকু কিনে নিতে। অবক্ষয়িত সমাজে অনন্তের প্রেমিকা সুলতা ও বোন মলিনা অসীমের কাছে তাদের নীতিবোধ বিক্রি করে দেয়। নিলামে ওঠে তাদের আত্মসম্মান, তালোবাসা, প্রেম। কিন্তু অনন্ত মতামত বিক্রি করে না। তার চোখে তখনও আশা। কোরাস চরিত্ররা তাকে ভয় দেখায়, প্রলোভন দেখায়। তার মতামতের দর নিলামে

বাড়তে থাকে। মতামত বিক্রি না করায় রাষ্ট্রব্যবস্থার চক্রান্তে অনন্তের শান্তি হয়। কিন্তু অনন্ত তো একা নয়। আরও অসংখ্য ঋজু মেরুদণ্ডের মানুষ যারা মতামত বিক্রি করেনি, তারা একত্রিত হয়। মলিনা ও সুলতাও মূল্যবোধ ফিরে পায়। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'-এর স্লোগানের মিছিলে পরাভূত হয় অসীম। নেপথ্যের কণ্ঠস্বর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসে পরাজিত দুর্যোধনের শেষ কয়েক মুহূর্তের কাহিনি বলতে থাকে।

গণনাট্য সংঘের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রব্যবস্থার শাসন ও শোষণের দর্পণে মধ্যবিত্ত বাঙালিকে নিজের দুরবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে শ্রেণিসচেতন প্রতিবাদী কণ্ঠে সোচ্চার করে তোলা। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যে নাটকগুলি হয়ে উঠেছিল বামপন্থী তাত্ত্বিক চেতনার সম্প্রসারণ ও সংঘাতপূর্ণ তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্যপূরণের অস্ত্র। তবে অধিকাংশ সদস্য মধ্যবিত্ত-শ্রেণি থেকে উঠে আসার কারণে তাদের বিভিন্ন শাখার নাটকে মধ্যবিত্তের যন্ত্রণার জীবনযন্ত্রণার প্রতি সংবেদনশীলতায় কোন খাদ ছিল না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপূরণ ব্যতিরেকে সেখানেই গণনাট্য সংঘের নাটকগুলির সাফল্য।

## তথ্যসূত্র :

- ১। আ. ইয়ের্মাকোভা, ভ. রাত্নিকভ; শ্রেণি ও শ্রেণিসংগ্রাম (অনুবাদ- ননী ভৌমিক), প্রগতি প্রকাশন, মক্ষো, ১৯৮৮, পৃ- ১২৮
- ২। অনিল বিশ্বাস (সম্পাদনা); বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯, পৃ- ৭৪-৭৫
- ৩। বিজন ভট্টাচার্য; নবান্ন, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪, পৃ- ৭৬
- ৪। তদেব, পৃ- ৭৬
- ৫। দর্শন চৌধুরী; গণনাট্য আন্দোলন, অনুষ্টুপ, ২০০৯, পৃ- ২২১
- ৬। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; নাট্যচিন্তা শিল্পজিজ্ঞাসা, ইম্প্রেসন সিন্ডিকেট, ১৯৭৮, পৃ- ৩৫০
- ৭। দিলীপ গুহ; স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবাংলায় গণআন্দোলন (১৯৪৭-৬২), তিন দশকের গণআন্দোলন (সম্পাদনা- অনিল আচার্য), অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২০১৮, পৃ- ৮২

OOF
৮। তদেব, পৃ- ৯৩

৯। অমলেন্দু সেনগুপ্ত; উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব, প্রতিভাস, ২০০৬, পৃ- ২৮৩

১০। তদেব, পৃ- ৩১৯

- ১১। মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত (সম্পাদনা); প্রাদেশিক পার্টি আলোচনা ১৯৫০, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, ষষ্ঠ খণ্ড, মনীষা, সেপ্টেম্বর ২০১০, পু- ৩৪৪
- ১২। অনিল বিশ্বাস (সম্পাদনা); সংকীর্ণতাবাদী হঠকারী লাইনের বিরুদ্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির আত্মসমালোচনা, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, দ্বিতীয় খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯, পু- ২১১

১৩। প্রাগুক্ত, শ্রেণি ও শ্রেণিসংগ্রাম, পু- ১৩৩

- ১৪। মণীন্দ্র মজুমদার; নাগপাশ, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রকাশনা, ১৯৫২, পৃ- ২৮
- ১৫। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়; দেশভাগ-দেশত্যাগ, অনুষ্টুপ, ২০২০, পৃ- ১৯
- ১৬। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; নাট্যচিন্তা শিল্পজিজ্ঞাসা, ইম্প্রেসন সিন্ডিকেট, ১৯৭৮, পৃ- ৩৫২
- ১৭। প্রাণ্ডক্ত, প্রাথমিক শিক্ষক আন্দোলন সম্পর্কে পার্টির কর্তব্য ১৯৫৩, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ- ৪৬১
- ১৮। প্রাগুক্ত, অম্বেষা সেনগুপ্ত; ১৯৫০-এর দশকে কলকাতায় গণআন্দোলনের দুটি মুহূর্ত : ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলন (১৯৫৩) ও শিক্ষক আন্দোলন (১৯৫৪), তিন দশকের গণআন্দোলন, পৃ- ২১৫

১৯। তদেব, পৃ- ২২১-২২২

২০। শ্যামল চক্রবর্তী; ৬০-৭০ ছাত্র আন্দোলন, প্রথম খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড,

૨૦১১, જ્- ১૧

- ২১। সুনীল দত্ত; হরিপদ মাস্টার, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৫৮, পৃ- ৬৯
- ২২। অনিল বিশ্বাস (সম্পাদনা); ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন, , বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, তৃতীয় খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৮, পৃ- ২২৮

- ২৩। প্রাগুক্ত, আগামী নির্বাচনে গণতান্ত্রিক ঐক্যের কর্মসূচি, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, তৃতীয় খণ্ড, পৃ- ৩১৪
- ২৪। অনিল বিশ্বাস (সম্পাদনা); পশ্চিম বাংলার আসন্ন সাধারণ নির্বাচন (১৯৬২) উপলক্ষ্যে কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, চতুর্থ খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৫, পু- ৮২
- ২৫। প্রাগুক্ত, পশ্চিম বাংলার নারীসমাজ, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, তৃতীয় খণ্ড, পূ- ৩৭৯
- ২৬। প্রাগুক্ত, তথ্য ও ঘটনায় কংগ্রেসের স্বরূপ, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ- ১৮২
- ২৭। ভানু চট্টোপাধ্যায়; আজকাল, বুক রিভ্যু, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃ- ৮৫-৮৬
- ২৮। মনোরঞ্জন বিশ্বাস; কর্মখালি, নবগ্রন্থ কুটির, শ্রাবণ ১৩৭৩, পৃ- ১০০-১০১
- ২৯। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়; ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও, গণনাট্য পত্রিকা, ১ বর্ষ, শারদীয়া সংকলন ১৩৭৪,

পৃ- ২৭

৩০। সুধী প্রধান; গণ-নব-সৎ-গোষ্ঠী নাট্যকথা, পুস্তক বিপণি, ১৯৯২, পৃ- ৩৯

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## প্রান্তিক জনজীবন এবং গণনাট্য সংঘের নাটক

গণনাট্য সংঘের নাটকে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের শ্রেণিচেতনা সম্পৃক্ত রাজনৈতিক অবস্থানের পাশাপাশি প্রান্তিক জনজীবনের প্রসঙ্গও উঠে এসেছে। 'প্রান্তিক' বলতে আমরা এখানে বোঝাতে চাইছি সমাজের সেই বিশেষ অংশের মানুষের কথা যারা তথাকথিত শ্রেণিচেতনার মধ্যে পড়ে না। অন্তত আমাদের আলোচিত সময়সীমার মধ্যে বাংলার বামপন্থী রাজনীতিতে শ্রেণিসংগ্রামে তাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি অগ্নি মিত্রের 'নবজন্ম', চিররঞ্জন দাসের 'নীলদরিয়া সমুদ্রের স্বাদ' বা মন্মথ রায়ের 'টোটোপাড়া' নাটকগুলির কথা। তিনটি নাটকই গণনাট্য সংঘ দ্বারা আমাদের আলোচিত সময়ের মধ্যে অভিনীত হয়েছিল। নাটকগুলির মূল চরিত্ররা অর্থনৈতিকভাবে 'প্রলেতারিয়েত' শ্রেণিভুক্ত হলেও রাজনৈতিক শ্রেণিচেতনার বিকাশে প্রধান ভূমিকাবাহী নয়। বিশেষ করে তাদের জীবনযাত্রা, ভাষা, সংস্কার, রীতিনীতি তথাকথিত সমাজব্যবস্থার নিরিখে প্রান্তবর্তী স্থানেই চিরকাল অবস্থান করেছে।

এখানে বলে রাখা ভালো যে 'প্রান্তিক' শব্দবন্ধ ব্যবহার করে আমরা 'নিম্নবর্গের ইতিহাস'কে ইঙ্গিত করতে চাইছি না। আন্তোনিও গ্রামশি 'সাব-অল্টার্ন' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন মুসোলিনির কারাগারে বন্দি অবস্থায় রচিত 'কারাগারের নোটবই' গ্রন্থে। তিনি 'সাব-অল্টার্ন' শব্দটিকে 'প্রলেতারিয়েত'-এর প্রতিশব্দ রূপেও ব্যবহার করেছিলেন।' বৃহত্তর অর্থে 'সাব-অল্টার্ন' শব্দটি শ্রেণিবিভক্ত সামাজিক বিন্যাসের স্তরে উৎপাদন প্রক্রিয়ার দ্বারা শোষিত শ্রেণিকে বোঝানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে রণজিৎ গুহ, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, ডেভিড হার্নিম্যান, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকরা যেভাবে এদেশের সমাজ-ইতিহাসে 'নিম্নবর্গ' ধারণাটি প্রয়োগ ও বিস্তার করেছেন, তার সঙ্গে গ্রামশির তত্ত্বের পার্থক্য রয়েছে। বিশেষ করে ইউরোপে পুঁজিবাদের উৎপত্তির সঙ্গে এদেশের গুণগত মানের তফাৎ থাকায় একটি অসম দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ নয়, নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চায় ধর্ম, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক প্রতিবেশ, ভাবাদর্শ গুরুত্বপূর্ণ একক রূপে দেখা দেয়। আমরা গণনাট্য সংঘের নাটকের আলোচনায় যে সময়সীমা বেঁধে নিয়েছি, তখনও ভারতবর্ষে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত ঘটেনি। আমরা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে দেখেছি শ্রেণিচেতনার বিকাশের ক্ষেত্রে গণনাট্য সংঘের নাটকে শুধু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের উপরেই অধিক জোর দেওয়া হয়েছে।

#### নবজন্ম :

অগ্নি মিত্রের লেখা 'নবজন্ম' নাটকটি ১৯৫৬ সালে গণনাট্য সংঘ দ্বারা প্রযোজিত হয়। ত্রি-সন্ধ্যায় ব্যাপৃত নাটকটি কলকাতার তলায় থাকা শহরের ভিক্ষুকদের জীবন নিয়ে রচিত। নাট্যকাহিনির সূত্রপাত হয় ডালহৌসি স্কোয়ার এলাকার একটি অফিস বাড়ির টানাবারান্দায়। মধ্য কলকাতার ভিক্ষুক সমাজের আস্তানা এটা। এই স্থান জুড়ে কয়েকজন ভিক্ষাজীবী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-স্বপ্নভগ্ন, রাগ-অভিমান-ভালোবাসার খেলা চলতে থাকে। তেমনই এক যুবতী ভিখারিনি আদুরির একমাত্র সম্বল তার সন্তান রুস্তম। রুস্তমের মুসলমান বাবা আদুরিকে ফেলে পালিয়ে যাওয়ার পর সে নাটুর সঙ্গে থাকে। নাটু অবশ্য চায় পকেটমারের সর্দার খয়রুলের কাছে রুস্তমকে বেচে দিতে।

কিন্তু আদুরি অন্য ধাতুতে গড়া। ভিখিরিদের পঞ্চিল সমাজে থেকেও সে তার জীবনকে স্বপ্ন-কল্পনায় সাজিয়ে তুলতে চায়। যে জীবন আদুরি পায়নি, রুন্তমকে সেই পথের অংশীদার করে তোলার জন্য সে সর্বস্ব বাজি রাখতে প্রস্তুত। তার সমাজের সমস্ত কুনজর থেকে সে রুস্তমকে আগলে রাখে। তার স্বপ্ন রুস্তম পড়াশোনা শিখে চাকরি করে বাবুদের মতো অফিস যাবে। আদুরি রুস্তমকে বলে,

"দেখিস নি, রোজ সকালে সেজেগুজে কত কত বাবুরা হেথা আসে—তারা চাকরি করে, কত টাকা কামাই করে। নেকাপড়া শিখলে তবেই তো অমন হওয়া যায় রে।"<sup>২</sup>

তাই রুস্তমের জন্য বর্ণপরিচয় আসে। ঘড়ির দোকানের জনৈক বাঙালি দারোয়ানকে 'টিউটর' রাখা হয় রুস্তমকে পড়াশোনা শেখানোর জন্য। শুধু রুস্তম নয়, আদুরি চায় তার কাছের মানুষদের জীবনযাত্রায় গুণগত পরিবর্তন আসুক। এই অন্ধকারের জীবন ত্যাগ করে এক নতুন জীবনের সন্ধান শুরু হোক। সে শৈলীকে বলে,

"কপালে যদি জোটে, ভগমান যদি মুখ তুলে চায় তবে পারিস তো একটা ভাল নোক দেখে বে' করে এ বিত্তি ছেড়ে দিস। গতরে খেটে যা জোটে তাই খেয়ে সে বাঁচা ঢের ভাল, তাতে ভাষ্যি আছে।"<sup>°</sup>

কিন্তু তাদের সমাজের চক্রব্যুহ থেকে বেরিয়ে আসার পথ আদুরির জানা নেই। একদিকে নাটু চায় রুস্তমকে বিদায় করতে, অন্যদিকে খয়রুল-পীরুরা চায় আদুরিকে দেহব্যবসার পথে নামাতে। তারা চক্রান্ত করে আদুরিকে অপহরণ করে। যদিও নাটুর ধারণা আদুরি পয়সার লোভে অসুস্থ রুস্তম ও পঙ্গু নাটুকে ফেলে পালিয়েছে। এই সময়ে উপস্থিত হয় আরেক বিপদ। সরকার 'হাল্লাগাড়ি' করে সমন্ত ভিক্ষুকদের সরকারি জায়গায় স্থানান্তরিত করছে। সেখানে আর্থিক ও সামাজিক পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে ভিক্ষুকদের নতুন জীবন দেওয়া হবে। ভিক্ষাজীবীরা পুর্নবাসন চায়নি। শত অন্যায়, শত অনাচারের মধ্যেও এই ফুটপাথ তাদের ঘরবাড়ি। এই ফুটপাথ জুড়ে তাদের ভালোবাসা, বিচ্ছেদ, হিংসা, অভিমান, সম্পর্কের ভাঙা-গড়া খেলা। সরকারি বিশৃঙ্খলায় শেষ পর্যন্ত তারা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেই অনিশ্চয়তা আজ তাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

নাট্যকাহিনির চূড়ান্ত দ্বন্দ্বের মধ্যে সমস্ত বাঁধন ভেঙে আদুরি এসে উপস্থিত হয়। আদুরি নতুন জীবন চেয়েছিল, কিন্তু সরকারি বদান্যতায় পুনর্বাসন চায়নি। সেটাও তো ভিক্ষাবৃত্তি। সে চেয়েছিল তার সন্তানকে প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে স্বনির্ভর করে তুলতে। আদুরির প্রেমের স্পর্শে সবাই মিলে পাড়ি দেয় এক নতুনের উদ্দেশ্যে। নাটকের শেষে নাটু বলে, "আদর, যেইতে তাখুন দেখচিনু

লালদিঘির ভরা জলে চাঁদের ছায়াটা পইড়েচ। ভারি সোন্দর নাগচিলো। তাখুন কি জানি তোকে ফিরে পাব?"<sup>8</sup> নাটককার প্রমাণ করে দেন পৃথিবীতে ভালোবাসার থেকে ছোঁয়াচে আর কিছু হতে পারে না। যদিও নাটকে নাটুর দুর্ঘটনার ঘটনা নেহাতই অপ্রাসঙ্গিক। ভিক্ষাজীবী মানুষদের জীবনের আর্থিক প্রেক্ষাপটের সামগ্রিকতা ও তাদের অতীত জীবন নাটকে প্রতিফলিত হয়নি। নাট্যদ্বন্দ্বও দৃঢ় ও একরৈখিক নয়। প্রথম ও দ্বিতীয় সন্ধ্যায় আদুরির মাতৃত্বের সঙ্গে ভিক্ষাজীবী সমাজের নিষ্ঠুরতার দ্বন্দ্ উঠে আসে। কিন্তু তৃতীয় সন্ধ্যায় 'হাল্লাগাড়ি' আবির্ভাবের বাহ্যিক দ্বন্দ্ব নাটকের গতিপথ ঘুরিয়ে দেয়। তবে দুর্বলতা সত্ত্বেও নাটককার কলকাতার নিচের তলার মানুষদের জীবনের কলুয়তার মধ্যে ভালোবাসার রঙিন পরশের সন্ধান এনে দেন।

#### নীলদরিয়া সমুদ্রের স্বাদ :

চিররঞ্জন দাস রচিত নাটিকাটির প্রেক্ষাপট কলকাতার ডক অঞ্চল। নাটকে দেখা যায় হামিদা তার স্বামী রসুলকে ছেড়ে সাজ্জাদের সঙ্গে ঘর করছে। সাজ্জাদ পশ্চিমা মুসলমান, পেশায় গরুর কশাই। অন্যদিকে রসুল জাহাজে খালাসির কাজ করে। বছরের বেশির ভাগ সময় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তার জাহাজ ঘুরে বেড়ায়। ফিরে আসার পরে তাকে কেউ কাজ দেয় না। ফলে রসুলের অবর্তমানে হামিদার জীবনে নেমে আসে ভয়ানক দুর্যোগ। তার আব্রু ছিল না, খাবার ছিল না, ওষুধ ছিল না। সব থেকে বড় বিষয় ভালোবাসার উষ্ণ নিরাপত্তা ছিল না। কিন্তু রসুল অপারগ,

"জানিস ঐ সমুদ্রের লোনা পানি সব সময় যেন আমাকে ডাকে। আমি ঘরে থাকতে পারি না। মন ছটফট করে। সেই থেকে আমি সমুদ্দুরে মানুষ হলাম।"<sup>৫</sup>

একদিন যে মেয়েটিকে রসুল নোয়াখালির নদী-খাল-বিল পার করে নিয়ে এসেছিল, আজ সমুদ্রের নোনা জলের তোড়ে তাদের ভালোবাসার সম্পর্ক ভেসে গেছে। তাই বাধ্য হয়ে হামিদাকে সাজ্জাদের আশ্রয়ে আসতে হয়েছে।

রসুলের পক্ষে সমস্ত ঘটনা সহজে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। নারীকে কেন্দ্র করে রসুল ও সাজ্জাদের বচসা প্রায় খুনোখুনির পর্যায়ে চলে যায়। দরিয়ার মানুষ রসুলের জীবনের একমাত্র গ্রন্থি হামিদা। হামিদাকে ভালোবাসার শক্তিতে সে সমুদ্রের সর্বগ্রাসী টান প্রতিহত করার শক্তি পায়। সে বলে,

"কালাপানির উপর দিয়া যাইতে যাইতে দেখছি—খালি নীল আসমান আর সমুদ্রের লোনা পানি। দিনের পর দিন দেখছি খালি সুয্যি ওঠে আর ডুবে। কখনও দেখি চিল ওড়ে। ভাবলাম কূলে আইছি। আজ কতদিন পর কূল পাইলাম—তোরে পাইলাম।"<sup>৬</sup>

কিন্তু রসুল কূলের সন্ধান পেলেও হামিদার হৃদয়ের সন্ধান পায় না। সাত সমুদ্র জয় করে আসা রসুল হেরে যায় নারীর ভালোবাসার কাছে। সে হামিদাকে কথা দিয়েছিল আর কখনও সমুদ্রে যাবে না। বলেছিল, "যে দরিয়া ঘর ভাঙে, সেই দরিয়ায় আমি আর যাইমু না।" কিন্তু ফের যখন তার কাছে ডাক আসে তখন সে সমুদ্রকেই বেছে নেয়। সমুদ্রের অতল আহ্বানে নারীর প্রেম, সংসারের স্বপ্ন অগভীর মনে হয়। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার অভিযানে ফিরে যাওয়ার আগে সে ফিরে আসার প্রতিজ্ঞা করে যায়—হামিদার জন্য, ভালোবাসার জন্য, জীবনের জন্য। দ্বন্দ্ব জর্জরিত কণ্ঠে সে বলে,

"দরিয়া ছেড়ে থাকা যায় না। জীবনডা যে ঐত্থানেই বাঁধা রয়েছে। আমি থাইকতে পারব না, চললাম... তুই আমার কূলের নিশান, তোরে ছাড়ি আমি যামু কই। আমি যেহানে যাই, তোর নিশানে আমি ঠিক পথ চিনা লয়ুম।"<sup>৭</sup>

চিররঞ্জন দাস গণনাট্য সংঘের পুনর্গঠন পর্যায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক ও নাটককার। গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত তাঁর নাটকগুলি প্রত্যক্ষ বামপন্থী রাজনীতির আদর্শে সম্পৃক্ত। এই নাটকটিও তার ব্যতিক্রম নয়। নাটকের শেষে আরেক খালাসি গোলাম রসুলকে উদ্দেশ্য করে বলে, "বলেছিলি মালিকানার যুগ না গেলে—এ ঘানি টানতেই হবে।" স্পষ্টতই নাটককার তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপূরণে রসুলকে বামপন্থী প্রতিপন্ন করেন। রসুলকে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের লড়াইয়ে জয়ী করার জন্য নাটককার অপ্রয়োজনীয়ভাবে রাজনৈতিক প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। রসুল তথাকথিত শ্রমিক নয়,

রাজনীতি তার জীবনযাত্রা ও জীবিকাকে নিয়ন্ত্রণ করে না। বিশেষ করে কলকাতার যে অঞ্চলে তার বসবাস সেখানে সংসদীয় রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন তোলা যায়। যদিও নাটককার ডক অঞ্চলের মানুযের খাদ্যাভ্যাস, অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা এমনকি অসামাজিক কার্যকলাপকেও গুরুত্ব সহকারে ফুটিয়ে তুলেছেন। নোয়াখালির রসুল-হামিদা ও পশ্চিমা মুসলমান সাজ্জাদের ভাষা, ধর্ম-সংস্কারের পার্থক্য নাটককারের সংলাপ ব্যবহারের মুন্সিয়ানায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

### টোটোপাড়া :

টোটো উপজাতি পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার 'টোটোপাড়া' অঞ্চলে বসবাসকারী একটি ক্ষুদ্র জনজাতি। ২০০১ সালের সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী তাদের জনসংখ্যা ১১৮৪।<sup>৮</sup> বর্তমানে পরিবহন ও পর্যটন ব্যবস্থার উন্নতি, সরকারি সংরক্ষণ নীতি এবং জনজাতিচর্চা প্রসারের ফলে টোটোদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমাদের ধারণা তৈরি হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কলকাতা শহরকেন্দ্রিক অধিকাংশ মানুষের কাছে টোটোরা ছিল অজ্ঞাত একটি উপজাতি। মন্মথ রায়ের 'টোটোপাড়া' নাটকটিতে টোটোদের সামাজিক জীবন, ধর্ম-সংস্কার, সম্পর্কের ইতিবৃত্ত আমাদের সামনে উঠে আসে।

নাটকের সূচনা হয় সূত্রধরের দীর্ঘ ভাষণের মাধ্যমে। বস্তুত সূত্রধরের বক্তব্যের দ্বারা নগরজীবনে অভ্যস্ত দর্শকদের 'টোটোপাড়া' ভ্রমণের প্রাথমিক তথ্য প্রদানের দায়িত্ব নেওয়া হয়। তারপর দেখা যায় টোটোদের শান্ত-নিস্তরঙ্গ জীবনস্রোতে লাবেজ ও যমনার বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ককে ঘিরে সংকট ঘনিয়ে আসে। লাবেজের দাদা পেস্তা টোটোর সঙ্গে তার স্ত্রী যমনার বয়সের বিস্তর পার্থক্য। পেস্তার গোপনীয় পুরুষত্বহীনতার ফলে যমনার মাতৃহৃদয়ের আশা অপূর্ণ থেকে যায়। হিমালয়ের বিস্তীর্ণ অরণ্যের মধ্যে লালিত যমনার প্রেমজীবনে বন্য উদ্দামতার অভাব তাকে যন্ত্রণাদীর্ণ করে তোলে। শুধু পেস্তার শারীরিক বীর্যহীনতা নয়, মানসিকভাবেও পেস্তার মধ্যে প্রেমিকসুলভ ব্যক্তিত্বের অভাব রয়েছে। অন্যদিকে প্রতিবেশী লাবেজ ও কুপিনির সুখী উদ্দাম প্রেমজীবন তাকে

কামনা-বাসনায় বেপরোয়া করে তোলে। যমনার অসহায়তা লাবেজের হৃদয়ের অন্ধকার অন্তঃস্থলকে এক 'অসামাজিক' সম্পর্কের মাদকতায় পরিপূর্ণ করে তোলে।

"যমনা: হামার একটা ছেলে নাই, লোকে আমাকে বাঁজা বলে, মাগিগুলো হামাকে দেখে আর হাসে। ক্যানে হামি বাঁচবে?

লাবেজ: (যমনার কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি) তু যা পাস নি, তু যা চাস, হামি তুকে দিবে।"<sup>৯</sup>

কিন্তু টোটো সমাজের নীতিকে অস্বীকার করে লাবেজ যমনাকে অধিকার করে নিতে পারেনি। তার গোষ্ঠীচেতনা ব্যক্তিগত কামনাকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি। হতাশ যমনার আর্তনাদ আত্মধিক্কারে রূপান্তরিত হয়, "উ ক্যানে ছিনিয়ে নিয়ে গেল না হামাকে তোর ঘর থেকে।"

ভালোবাসার ঔরসজাত সন্তানের অভাব যমনার মাতৃহৃদয় ও প্রেমিক-হৃদয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দাবানল সৃষ্টি করে। লাবেজের স্ত্রী কুপিনির তুলনায় তার রূপ-গুণ-যৌবনের অপূর্ণতা নেই, তবুও তার শরীর-মনের শূন্যতা পেস্তার গোষ্ঠী দাসত্বের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে মরে। বয়স্ক পেস্তার স্ত্রী হওয়ার দৌলতে তাকেও 'বুড়ি'র তকমা পেতে হয়। সমাজ তাকে 'বাঁজা' প্রতিপন্ন করে। অথচ ঘরের সত্যিটা শুধু যমনা আর পেস্তাই জানে।

"পেস্তা: তবে কি তু হামাকে ছাড়িয়া দিবে? চিমি হামাকে ছাড়িয়া গেল। ঘরে এলি তু। হামার পূজা তুকে হামি দিলাম—তু কেন যাবে?

যমনা: চিমি ছেলে না পেল—চলে গেল। হামার কোল খালি আছে—হামি ছেলে চাই। হামি থাকবে কেনে?"<sup>20</sup>

টোটো সমাজের রীতি নিয়েই সে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে। সমাজ বহির্ভূত সম্পর্কের অপরাধে লাবেজের শাস্তি হয় না, কারণ কুপিনির আগত সন্তানের পিতৃকর্তব্য পালন করে তাকে টোটোগোষ্ঠীর

সংখ্যাবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। অন্যদিকে যমনাকে টোটোপাড়া থেকে বহিষ্কার করা হয়। তার মনে হয় এটা তার শাস্তি নয়, সে যেন এই সমাজের কেউ নয়।

কিন্তু এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যমনা কীভাবে অর্জন করল? নাটককার তার উত্তর দেননি। বরং যেভাবে তার হৃদয়ের যন্ত্রণাকে নাটকে উন্মোচিত করা হয়েছে, তার ফলে যমনাকে এক অশিক্ষিতা বন্য রমণী মনে হয় না। শুধু তার ভাষা ও সংলাপ টোটো উপজাতির। তার বিচ্ছিন্নতা, আত্মসচেতনতা এবং গোষ্ঠীকে অতিক্রম করে যাওয়ার সাহস ও স্পর্ধায় তাকে আধুনিক জীবনশিক্ষার জ্ঞানসম্পন্ন নারী বলে মনে হয়। টোটোদের আর্থিক জীবনযাত্রার সংকট নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিসরে পরিস্ফুট হয়নি। যদিও নাটককার টোটো উপজাতির মানুষদের গোষ্ঠীবদ্ধ সামাজিক আচার, ধর্ম-সংস্কার, জীবনের বিন্যাস দেখানোর ক্ষেত্রে যথার্থতা অবলম্বন করার চেষ্টা করেছেন। সন্তানহীন যমনার স্বপ্নদৃশ্যকে প্রথমে ডাইনির লীলাখেলা বলে সন্দেহ করা হলেও পরে তাকে 'ফুলপরী' রূপে সম্বোধন করা হয়।

নাটকে যমনার চরিত্রসৃষ্টিতে আধুনিকতার প্রভাব কিংবা টোটোদের অর্থনৈতিক অবস্থার বাস্তবানুগতার অভাবের জন্য আমরা নাটককারকে সম্পূর্ণ দায়ী করতে পারিনা। প্রসঙ্গত নাটকটি প্রযোজিত হয়েছিল ১৯৫৭ সালে। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে টোটোদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের অন্দরমহলে প্রবেশ করে তার রূপ-রসকে নাটকে ব্যবহার করা দুঃসাধ্য কল্পনামাত্র। অন্তত বাংলার শহুরে প্রসেনিয়ম কেন্দ্রিক নাট্যচেতনায় সেটা সম্ভব ছিল না। তার দায় আমাদের শিক্ষিত, মার্জিত, তদ্র নাগরিক জাত্যভিমানকে বহন করতে হবে। অথচ টোটোদের মতো অসংখ্য উপজাতি স্বাধীন ভারতের নাগরিক । ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের জাতিগত উন্নাসিকতার কারণে তাদের দীর্ঘদিন পিছিয়ে থাকতে হয়েছে। এ-দেশের আপামর জনসাধারণের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে টোটোসহ অসংখ্য উপজাতির রূপ-বর্ণ-ভাষা-খাদ্যাভ্যাস-জীবনচর্যার সমান অধিকার প্রয়োজন। বর্তমানে পর্যটন ব্যবস্থার উন্নতির কারণে টোটোদের আর্থিক স্বাবলম্বিতা এসেছে। তাদের সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। আমরা আশা করি টোটোদের মতো অসংখ্য উপজাতি তাদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে দেশের সামগ্রিক উন্নতির অন্যতম স্থপতি হয়ে উঠবে।

তথ্যসূত্র :

- ১। পার্থ চট্টোপাধ্যায়; ভূমিকা: নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস, নিম্নবর্গের ইতিহাস (সম্পাদনা-গৌতম ভদ্র), প্রতিভাস, ১৯৯৮, পৃ- ৩
- ২। অগ্নি মিত্র; নবজন্ম, একাঙ্ক নাটক সংকলন, পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৮, পৃ- ৯
- ৩। তদেব, পৃ- ৭
- ৪। তদেব, পৃ- ৪০
- ৫। চিররঞ্জন দাস; সমুদ্রের স্বাদ, গণনাটক, পিপলস থিয়েটার পাবলিকেশনস, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ, পৃ- ২৬
- ৬। তদেব, পৃ- ৩৫
- ৭। তদেব, পৃ- ৩৭
- b + https://en.wikipedia.org/wiki/Toto\_people
- ৯। মন্মথ রায়; টোটোপাড়া, মন্মথ রায় নাট্য গ্রন্থাবলি, প্রথম খণ্ড, একাঙ্ক (প্রথম পর্ব), মনমথন প্রকাশনী, পৃ- ৩০০
- ১০। তদেব, পৃ- ৩০৩

## তালিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ : কৃষি-অর্থনীতি, কৃষক শ্রেণি, কৃষক আন্দোলন এবং গণনাট্য সংঘের নাটক

নাটক	নাটককার	প্রযোজনা সাল
নবান্ন	বিজন ভট্টাচার্য	2988
নয়ানপুর	অনিল ঘোষ	১৯৪৮
ডাক/ সাড়া	অসিত ঘোষাল	১৯৪৮
তরঙ্গ	দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৪৯
এই মাটিতে	সলিল চৌধুরী	১৯৫১
অরুণোদয়ের পথে	সলিল চৌধুরী	১৯৫১
আবাদ (নাট্য-রূপান্তর)	গোবিন্দ চক্রবর্তী	১৯৫২
মা (অনুবাদ)	অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৫৯
আমার মাটি	মনোরঞ্জন বিশ্বাস	১৯৫৯
অন্নপূর্ণার দেশে	শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৬৫

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শ্রমিক শ্রেণি, শ্রমিক আন্দোলন এবং গণনাট্য সংঘের নাটক

নাটক	নাটককার	প্ৰযোজনা সাল
মৃত্যু নাই	মণীন্দ্র মজুমদার	১৯৪৮
সব পেয়েছির দেশ	অরুণ চৌধুরী	১৯৪৯
পূৰ্ণগ্ৰাস	দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৪৯
মশাল	দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ን୭୯୫
মোকাবিলা	দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ንቃራራ
ইস্পাত	মমতাজ আহমেদ খাঁ	১৯৫৬
দ্বান্দ্বিক	অমর গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৫৯
আজকের উত্তর	অজিত গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৬০
স্পেশাল ট্রেন	উৎপল দত্ত	১৯৬২

নাটক	নাটককার	প্রযোজনা সাল
নবান্ন	বিজন ভট্টাচার্য	১৯৪৪
জনান্তিক	সলিল চৌধুরী	১৯৪৮
সংকেত	সলিল চৌধুরী	১৯৪৮
বাস্তুভিটা	দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৪৮
সব পেয়েছির দেশ	অরুণ চৌধুরী	১৯৪৯
নাগপাশ	মণীন্দ্র মজুমদার	১৯৫১
আজকাল	ভানু চট্টোপাধ্যায়	১৯৫৩
হরিপদ মাস্টার	সুনীল দত্ত	\$৯৫8
মোকাবিলা	দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ንቃራራ
কর্মখালি	মনোরঞ্জন বিশ্বাস	ን৯৫৭
জীবন যৌবন	অমর গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৫৮
ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও	অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৬১
একটি যুদ্ধের ইতিহাস	অজিত গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৬৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মধ্যবিত্ত শ্রেণি, মধ্যবিত্ত জীবনযন্ত্রণা এবং গণনাট্য সংঘের নাটক

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : প্রান্তিক জনজীবন এবং গণনাট্য সংঘের নাটক

নাটক	নাটককার	প্রযোজনা সাল
নবজন্ম	অগ্নি মিত্র	১৯৫৬
টোটোপাড়া	মন্মথ রায়	ን৯৫৭
নীলদরিয়া সমুদ্রের স্বাদ	চিররঞ্জন দাস	১৯৬০